বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

মাসিক

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

মার্চ, ২০২৫ খ্রি.–৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

"ভ্রমণ তোমাকে নির্বাক করবে, তারপর তোমাকে একজন গল্পকারে পরিণত করবে।" –ইবনে বতুতা

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

মাসিক

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

৪থ বর্ষ | ৮ম সংখ্যা | মার্চ, ২০২৫ খ্রি.

প্রতিষ্ঠা

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

উপদেষ্টা

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা.

প্রধান সম্পাদক

মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক

উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পাদক

বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক

কাজী মা'রুফ
রাশেদ নাইব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মুহা. সায়েম আহমাদ

ব্যবস্থাপনায়

আব্দুল্লাহ আল মামুন আশরাফী, মুফতী ইমদাদুল্লাহ,
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী, আনিসুর রহমান আফিফি,
মুফতী মাসউদ আলিমী, রহমাতুল্লাহ জুবায়ের,
মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ, মুহা. হাছিব আর রহমান,
মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসিন,
শামসুল আরেফিন, তাশরীফ আহমদ,
জাবের মাহমুদ, মাও. হাবিব উল্লাহ,
জুবায়ের আহমেদ, মুফতী সাইফুল্লাহ,
হুসাইন আহমদ, মুহা. আব্দুর রশীদ।

যদি নবীনকণ্ঠ 'প্রিন্ট' করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম, তাহলে বেশি ভালো লাগত। আপাতত 'পিডিএফ' করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ। দু'আয় আমাদের স্মরণ করবেন।

যোগাযোগ

অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা। সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

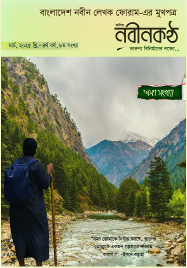

৪র্থ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
মার্চ-২০২৫ খ্রি.

লেখকসূচি

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে নবীনকণ্ঠ'র এবারের আয়োজনে যারা ভ্রমণবিষয়ক লেখা পাঠিয়েছেন:

প্রবন্ধ, ফিচার, গল্প ও ভ্রমণকাহিনি

আফছানা খানম অথ�ৈ
আহমাদ আদীব
আমাতুল্লাহ শারমিন
আমিনুল ইসলাম সৈকত
আনিসুর রহমান হাসান
আজিজুল্লাহ ফয়জ আরিব
বায়েজিদ বিন আবু বকর
বেলাল বিন জামাল
বিনতে আব্দুল হামিদ
বিনতে ইউনুস
গৌতম সমাজদার
জুবাইর আল হাদী
মাসুমা সুলতানা হাসনাহেনা

জাবের আবদুল্লাহ
শেখ একেএম জাকারিয়া
জুনায়েদ আহমেদ
খাদিজা আক্তার
ওবায়দুল্লাহ আল মাহমুদী
সাঈদুর রহমান লিটন
মাজহারুল ইসলাম আবির
হাফিজ মাছুম আহমদ
বি এম মিজানুর রহমান
মধুমিতা দত্ত
মুমতাহহিনা খাতুন
নুসরাত জাহান
রাহিল

মুফতী রহমতুল্লাহ জুবাইর
রবিউল হাসান আরিফ
রুজি আক্তার নিশাত
মুহা. শাহাদাত হুসাইন
সাজিদ বিন আওলাদ
সানজানা আক্তার
রহমতুল্লাহ শিহাব
সজীব মাহমুদ
শংকর ব্রহ্ম
সুদীপ দাশ
তাসনীম হোসেন

মাসিক
নবীনকণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা মহান রবের, যিনি মানুষের অন্তরে জানার ও দেখার আকাঙ্ক্ষা দান করেছেন। যিনি সীমানাহীন পৃথিবীকে রহস্য, সৌন্দর্য ও জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর অসীম অনুগ্রহে মাসিক নবীনকণ্ঠ তার পাঠকদের জন্য আরও একটি সংখ্যা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর এবার, আমাদের এই বিশেষ আয়োজন- ভ্রমণ সংখ্যা!

প্রিয় পাঠক, আপনাদের ভালোবাসা আমাদের কাছে যে, কত মূল্যবান, তা বলে বোঝানো কঠিন। আপনাদের অনুপ্রেরণা ও অংশগ্রহণ আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেয়। প্রতিটি সংখ্যার পর আমরা নতুন স্বপ্ন দেখি, নতুন ভাবনা বুনে চলি। আপনাদের চাহিদা, ভালোবাসা ও আগ্রহের ভিত্তিতেই আমরা এগিয়ে চলছি, খুঁজছি নতুন নতুন দিগন্ত। তারই ধারাবাহিকতায় এবার আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ভ্রমণ সংখ্যা- একটি ভিন্ন স্বাদের আয়োজন।

আমার ব্যক্তিগতভাবেও ভ্রমণের প্রতি গভীর টান রয়েছে। নতুন জায়গা দেখা, মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, প্রকৃতির বৈচিত্র্য উপভোগ করা আমার হৃদয়ের এক বিশেষ আনন্দ। প্রতিটি পথ যেন এক নতুন গল্পের শুরু, প্রতিটি স্থান যেন এক নতুন অধ্যায়। তাই যখন বিশেষ সংখ্যা করার চিন্তা এল, তখন মনে হলো, কেন না এমন একটি সংখ্যা করি, যেখানে পাঠক-লেখকেরা তাদের ভ্রমণ কাহিনি ভাগ করে নিতে পারেন! যেখানে সবার অভিজ্ঞতা মিলে গড়ে উঠবে এক অপূর্ব ভ্রমণপথ, যা আমাদের কল্পনায় নিয়ে যাবে দিগন্তের ওপারে। এই ভাবনা থেকেই আমাদের ভ্রমণ সংখ্যার যাত্রা শুরু।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা যে সাড়া পেয়েছি, তা আমাদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঠক ও লেখকেরা তাদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আনন্দ-বেদনার কাহিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এত বৈচিত্রপূর্ণ লেখা দেখে মন ভরে গেছে। তবে একটি কঠিন সত্য হলো, আমরা সব লেখা প্রকাশ করতে পারিনি। সাহিত্যিক মান, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও সম্পাদনার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে অনেক সুন্দর লেখা নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছি। যাদের লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, তারা যেন নিরাশ না হন। আপনাদের লেখা আমাদের কাছে মূল্যবান, ভবিষ্যতে আরও সুযোগ থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

একটি ভালো ভ্রমণ লেখা কেবল স্থান বা গন্তব্যের বিবরণ নয়। এটি অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার মিশেলে এক অনন্য সৃষ্টি। একটি ভালো ভ্রমণকাহিনি পাঠককে শুধু তথ্য দেয় না, বরং সে যেন লেখকের সঙ্গে পথ চলে, বাতাসের স্পর্শ পায়, সূর্যাস্তের রঙ দেখে, পাহাড়ের গন্ধ পায়। তাই ভালো ভ্রমণ লেখার কিছু মূল বৈশিষ্ট্য হলো- **১. অভিজ্ঞতার গভীরতা** - লেখকের দেখা, শোনা ও অনুভব করা বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

২. চিত্রকল্প ও বর্ণনার শক্তি - স্থানটির রূপ-রঙ যেন পাঠকের মনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।
৩. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ছোঁয়া - শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, স্থানটির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার কথা থাকলে তা লেখা সমৃদ্ধ হয়।
৪. নিতান্ত সাধারণ নয়, ব্যতিক্রমী কিছু - এমন কিছু তথ্য বা অভিজ্ঞতা থাকলে পাঠক বেশি আগ্রহী হবেন, যা সাধারণত জানা হয় না।
৫. সাজানো ভাষা ও শৈলী - সহজ, প্রাণবন্ত ও সাবলীল ভাষায় লেখা হলে পাঠক তা বেশি উপভোগ করেন।

এই সংখ্যার পর আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। পাঠকদের এমন আগ্রহ, লেখকদের এমন উদ্যম আমাদের নতুন উদ্যোগ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা চাই, ভবিষ্যতেও আপনাদের এমন গল্প, অভিজ্ঞতা, লেখনীতে সমৃদ্ধ হোক নবীনকণ্ঠ। আমরা আরও বড় পরিসরে ভ্রমণের গল্প, অভিজ্ঞতা এবং নতুন নতুন বিষয় নিয়ে কাজ করতে চাই।

আরও একটি সুখবর দিচ্ছি-আমরা এবারের সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকদের মধ্য থেকে সেরা চারজন লেখক-লেখিকাকে নির্বাচন করব, ইনশাআল্লাহ। তাদের জন্য থাকছে পুরস্কার ও সম্মাননা সনদ। এটি আমাদের সামান্য প্রয়াস, আপনাদের প্রতিভার স্বীকৃতি।

সর্বশেষে, যারা আমাদের এই প্রয়াসে অংশ নিয়েছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন, আমাদের লিখনির মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে ভালো কিছু পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ভ্রমণ কখনো শেষ হয় না। একটি পথের শেষ মানেই আরেকটি পথের শুরু। নবীনকণ্ঠের এই সংখ্যা তারই একটি ক্ষুদ্র রূপ। আমাদের যাত্রা চলবে, আপনাদের ভালোবাসায়, আপনাদের সঙ্গেই।

সম্পাদক,
মাসিক নবীনকণ্ঠ (তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে)

ভ্রমণঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মুফতী রহমতুল্লাহ জুবাইর

কিছু ভ্রমণ ও কিছু বিনোদন মানুষ হিসেবে অবশ্যই প্রয়োজন, যা মানুষকে প্রতিনিয়ত আনন্দ দেয়। মনকে প্রফুল্ল করে তুলে। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রবের কুদরত দেখে চক্ষু শীতল হয়। রবের পরিচয় অর্জন করা যায় এবং তার শক্তি ও সক্ষমতার প্রতি অনুগত হওয়া যায়। নিজের ঈমান আমল দৃঢ় করা যায়। এছাড়া জ্ঞানের পরিধিও বাড়ে। সর্বোপরি মন প্রফুল্ল রাখতে ও শারীরিক সুস্থতা ধরে রাখতে এবং জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে ভ্রমণের বিকল্প নেই।

ইসলাম ভ্রমণের প্রতি কখনো নিরুৎসাহিত করে না। তবে খারাপ উদ্দেশ্যে ভ্রমণের অনুমতিও ইসলাম প্রদান করেনি। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা

নিজেই ভ্রমণের মাধ্যমে তার অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টির বিশালতা অবলোকন করে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছেন।
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, পৃথিবী জুড়ে বিশ্বাসীদের জন্য আছে অসংখ্য নিদর্শন।(সুরা জারিয়াত:২০)
অন্যত্র ইরশাদ করেন, বলে দাও, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো। অতঃপর দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল? (সুরা আনআম:১১)

আরো সত্য যে, মানুষ ভ্রমণের মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারে নিজের অবস্থান। জীবন জুড়ে রবের এত এত নেয়ামত তখনি দৃশ্যমান হয়ে উঠে, যখন মানুষ মানুষের বৈচিত্রময় জীবন স্বচক্ষে অবলোকন করে। সরেজমিন উপলব্ধি করে ফেলে জীবনের প্রাপ্তি আর অর্জনটুকু। এখানেই এসে আস্তিক আর বিশ্বাসীদের আস্থা আরও সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নানা কীর্তি দেখে চিন্তার জগত আরো প্রসারিত হয়। আর মানবজীবন তো অনন্ত ভ্রমণের অংশবিশেষ, যার শুরু রূহের জগত থেকে আর শেষ পরকালের অনন্ত জীবনে। তাইতো প্রতিনিয়ত মানুষ বিশাল এ পৃথিবীর নানা অংশে ছুটে যায় সৃষ্টির বিশালতা আর প্রকৃতির রূপকে আপন করে দেখতে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দ্বীনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করেন আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে। (আলে ইমরান:১৯০,১৯১)
আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, বুদ্ধিমানরা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাদি এবং সামগ্রিক সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখে বিবেক-বুদ্ধিতে এমন এক সত্তার সন্ধান পায়, যার শুনিপুন হাতে সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত। আর ভ্রমণের মধ্য দিয়েই স্বাভাবিক অসংখ্য অলৌকিক আশ্চর্যিত নিদর্শনাদি দৃশ্যপটে আসে।
এজন্য আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যস্থতায় বান্দাকে ভ্রমণের নির্দেশ দিচ্ছেন। ইরশাদ করেন, বলুন তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখো তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।(সূরা রুম-৪২)
আরো ইরশাদ করেন, বলুন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখো কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পূর্ণর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই

আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।(সূরা আনকাবুত-২০)
উক্ত দুটো আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ভ্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা থেকে শিক্ষা অর্জন করার আদেশ করেছেন।

প্রাকৃতিক নিদর্শনাদি দেখার মাধ্যমে রবের বড়ত্ব আর পরিচয় যতটুকু সহজে অর্জন হয় তা কখনো নির্জনতার মাধ্যমে অর্জন হয় না। এজন্য মাঝে মাঝে ভ্রমণ করা উচিত। শিক্ষা সফর হওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তারা ভূখন্ডে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন হতে পারতো। (সুরা হজ্জ:৪৬)

আমাদের ভ্রমণগুলো শুধু বিনোদন কেন্দ্রিক না হয়ে আরো শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। হোক তা পারিবারিক ভ্রমণ বা প্রাতিষ্ঠানিক ভ্রমণ। কাছে, দূরে বা দেশে-বিদেশে বহু জায়গায় তো ভ্রমণ হয়ে থাকে। আবার জীবনের বাস্তবতায় নানা প্রয়োজনে আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর দূরান্তেও যেতে হয়। এতে শরয়ী দিকনির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করলে ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত বলে গণ্য হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টিরহস্য অবলোকনের মাধ্যমে জীবন ও জগত সম্পর্কে প্রকৃতবোধ জাগ্রত হবে। ভালো কাজের নিয়ত করার মাধ্যমে সাওয়াবও অর্জন হবে। আনন্দ বিনোদনের মাধ্যমে মন মস্তিষ্কও প্রফুল্ল হবে। দিল-দেমাগ আরো প্রশস্ত হবে। চিন্তার সংকীর্ণতা দূর হয়ে দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তাও বাড়বে।

শরয়ী দিকনির্দেশনা হলো:
এক. ইস্তিখারা করা। যেই উদ্দেশ্যে বা যেই স্থানের লক্ষ্যে ভ্রমণ করবে তা আদৌ মঙ্গলজনক হবে কিনা ইস্তিখারার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া।
দুই. কাঙ্ক্ষিত ভ্রমণের যানবাহন আসবাবপত্র ও স্থান সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে রাখা।
তিন. একাকি ভ্রমণ না করে ভালো কাউকে ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করা।
চার. দলবদ্ধ ভ্রমণে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজনকে আমির বা গ্রুপ লিডার বানানো।
পাঁচ. আপনজন ও পরিচিতজনদের সাথে দেখা করে দোয়া নিয়ে যাওয়া।
ছয়. ভ্রমণে বের হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা।
সাত. ভ্রমণের দোয়া ও যানবাহনে উঠার দোয়াগুলো গুরুত্বসহকারে পড়া।
আট. ভ্রমণকালিন সময় গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার জিকিরে মশগুল থাকা।
নয়. ভ্রমণকালিন সময় দোয়া কবুল হয়, তাই এসময়ে বেশি বেশি দোয়া করা।

দশ. ভ্রমণ থেকে ফেরার সময় আগ থেকে অবগত করিয়ে বাড়িতে আসা।

এগারো. ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে প্রথমে নিজ মহল্লা মসজিদে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা।

বারো. নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা।

ভ্রমণের মাধ্যমে যেমন মানব কুলের বৈচিত্রময় জীবন স্বচক্ষে দেখা যায়, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য অগণিত সৃষ্টিজীব পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ এবং তাদের বৈচিত্রময় জীবন সংগ্রামও দেখা যায়। কারণ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিরহস্যের নানা উপকরণ, যা মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তা এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কীভাবে উচ্চ করা হয়েছে এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কীভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (গাশিয়াহঃ ১৭-২০)

এছাড়াও ভ্রমণে শুধু জ্ঞানার্জন আর বিনোদন নয়, বরং এতে দুশ্চিন্তা দূর হয়। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পথ উন্মোচন হয়। শিষ্টাচার ও সৌজন্যতা শিখা যায় এবং শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তি অর্জন করা যায়। ভ্রমণপ্রিয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিব্যক্তিও তাই বলে। নানান বৈশিষ্ট্য আর প্রকৃতির অধিকারী এ ভূখন্ডে ভ্রমণ না করলে অনেক কিছুই অজানা থেকে যাবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সামর্থানুযায়ী পৃথিবীতে ভ্রমণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক, শিক্ষাসচিব, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ সাভার, ঢাকা।

"সুন্দরবনের পথে"

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আল মাহমুদী (কাশিয়ানী)

রুপসা থেকে দিনে দুইটা ট্রলার যায় সুতারখালি। একটা বিকেল পাঁচটায়। পরেরটা সাড়ে পাঁচটায়। আমরা তখনও রাস্তায়। দুপুরে খাইনি। মাওয়া ঘাটের ওপারে বসে ছিলাম দুই ঘণ্টা। এপারে দেড় ঘণ্টা। নদীতে দুই, আড়াই ঘণ্টা। রুপসা ব্রিজ পাড় হয়েই ঘাটে চলে এলো পিকআপ। এসে দেখি ট্রলার একটা ছেড়ে গেছে, আরেকটা ছাড়ার অপেক্ষায় আছে। তড়িৎ গতিতে বস্তাগুলো নামানো হলো। চৌদ্দটা বস্তা। একেকটা দুই মণের উপরে ওজন। আমি ট্রলারে উঠে বস্তাগুলো নামাতে সাহায্য করলাম। বাকি সবাই উপরে ব্যস্ত। পিকআপের ড্রাইভার সারাদিন কিছু খাননি, উনাকে নিয়ে সাইমুম ভাই

খেতে গেছেন। এদিকে ট্রলারে বসা যাত্রিরা চরম বিরক্ত। ট্রলার প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল, মাঝখান দিয়ে আমরা এসে বিলম্ব করে দিলাম।
সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে চ্যাঁচামেচি করতে লাগল। ওদিকে সাইমুম ভাই এখনও আসেননি। বাকি দুজন পাড়ে দাঁড়িয়ে ঘাটের ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছিলেন, পাশাপাশি সাইমুম ভাই এর জন্য অপেক্ষা করছেন। ট্রলারের যাত্রীদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। তাঁরা এখন রীতিমতো চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিলো। ট্রলারের ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে, ট্রলার ছেড়ে দিলো!

ট্রলারে আমি একলা। পাড়ে আরও তিনজন থেকে গেছে! পাড় থেকে আসিফ ভাই আর সাফা ভাই চোখ বিস্ফোরিত করে দাঁড়িয়ে আছে। এখন কি হবে?

আমি চিৎকার করে ড্রাইভার কে বলতে লাগলাম, "মামা ট্রলার থামান। ট্রলার থামান। ওদেরকে নিয়ে যান। এতগুলো বস্তা, আমি একলা কি করব?"
কে শোনে কার কথা?

অবস্থা বেগতিক দেখে আমি এবার চিৎকার করে বলা শুরু করলাম, "ফজরের পর নাশতা না খেয়েই পিকআপ এ উঠেছি। মাওয়া ঘাটে ছিলাম ছয় ঘণ্টা। আমরা জানি ট্রলার পাঁচটায়। কিন্তু কি করব ঘাটে জ্যাম ছিল। দুপুরে না খেয়েই বাকি রাস্তাটা এসেছি। এখন বলেন আপনারা দু'মিনিট সময়ও কি আমাদের দেবেন না!"
ট্রলারের সবাই কথাগুলো মন দিয়ে শুনল। তারপর ড্রাইভার কে বলা শুরু করল, "আহারে, পোলাপানগুলোকে নিয়া আসো। এরা ঢাকা থেইক্কা সেই সকালে বের হইছে"

ঘাট থেকে বেশি দূর আগাইনি। ট্রলার তখন মাঝ নদীতে। রুপসা ব্রিজ সামনে। ড্রাইভার ট্রলার ঘুরালেন। যাত্রিরা বলাবলি করতে লাগল, "এই ঘাটে এই প্রথম ট্রলার ঘুরল। ইতিহাস। এমনটা আগে কখনো হয়নি।"
ঘাটে বাকি তিনজন দাঁড়ানো ছিলেন। ট্রলার ঘুরতে দেখে মুখে হাসি দেখা দিলো। আমরা সবাই ট্রলারে উঠে বসলাম। আস্তে আস্তে ট্রলার চলতে শুরু করল।
হুহু বাতাস। অস্তমিত সূর্য। খোলা ডেকের উপর বসে আছি। চালনা, দাকোপ, কামারখালি, রামনগর হয়ে ট্রলার যাচ্ছে সুন্দরবনের দিকে। মাঝে মাগরিবের নামাজটা ট্রলারেই জামাত করে পড়ে ফেললাম। দুলতে দুলতে যখন রুকুতে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল

এই বুঝি পড়ে যাব। যখন সিজদায় যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ট্রলার উলটে গেল।

অনেক পরে, দূরে হলুদ আলো দেখলাম। বলা হলো, “এটা মংলা বন্দর, ওখান থেকেই আলো আসছে” একটু পর দেখলাম, ভাসমান হাসপাতাল। তারও অনেক পরে তারার আলোয় দেখলাম সুন্দরবন।

সুন্দরবন! কত ছবি দেখেছি, কথা শুনেছি। এই সেই সুন্দরবন। মনের চোখে বাঘ হরিণ ছুটতে দেখলাম। মনের কানে শুনলাম, রক্ত হিম করা বাঘের গর্জন। আকাশে চাঁদ ছিল না। কিন্তু তারার আলোয় ঠিকই পথ চিনে চিনে ট্রলার এগিয়ে চলল সুতারখালির দিকে।

ট্রলার এগোচ্ছে সুন্দরবনের পাশ ঘেঁষে। প্রায় চার ঘণ্টা পর আমরা পৌঁছলাম সুতারখালি। তখন নদীতে জোয়ার চলছে। ট্রলার থামল একেবারে মাদরাসার পাশে।

নদীর পাড়েই মাদরাসা। পানি থেকে চার হাত দূরেই মাদরাসার বেড়া। আমরা নামলাম। বস্তাগুলো নামানো হলো। রাতে মসজিদে ছিলাম। রাতের খাবার খেলাম এক ভাই এর ঘরে। খাবারটা সুস্বাদু, টাটকা।

পরদিন। প্রায় দুই শত মাদরাসার ছাত্র ছাত্রীদের হাতে ইফতারের প্যাকেট দেওয়া হলো। শিক্ষকদেরও দেওয়া হলো। আনন্দমাখা মুখগুলো দেখে মনটা আনন্দে ভরে গেল। ইফতার এর প্যাকেট হাতে মাদরাসার পিচ্চিকিচ্চিরা..

তাদেরকে বলা হলো, কেন আমরা রোজা রাখব। রোজা রাখলে আল্লাহ কী পুরস্কার দেবেন আমাদের। রিজিক কীভাবে আসে আল্লাহর তরফ থেকে। রোজাদার ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাত দেবেন। আরও কিছু ইন্সপিরেশনাল কথা। বাচ্চাগুলো সব মন দিয়ে কথা গুলো শুনেছিল।

মাদ্রাসাটার অবস্থা ভালো না। মেঝের মাটিটা কেমন যেন। উঠানে একটু বৃষ্টি হলেই আঠা-আঠা কাদা। ইট দিয়ে ব্রিজ বানাতে হয়। সেটাই হাঁটার রাস্তা।

তারপর, আমরা গেলাম কালাবগী। ঘূর্ণিঝড় অধ্যুষিত এলাকা। ঘূর্ণিঝড় আইল্যা এই গ্রামের কী পরিমাণ ক্ষতি করেছে একবার ঘুরে আসলে দেখতে পারতেন। তিন চার বছর পরও গ্রামবাসী সেই ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ওখানেও ইফতার দেওয়া হবে। বস্তাগুলো ট্রলারে করে এসেছে। আমরা হেঁটেই গেলাম।

গাছে আবু হুরায়রা, নিচে ইখফা খেজুর কুড়াচ্ছে। আমাকেও একটু ভাগ দিল ওরা। কালাবগী বাংলাদেশের ওই দিকের সর্বশেষ গ্রাম। তারপরই সুন্দরবন শুরু। প্রায় সত্তর কিলোমিটার জুড়ে বন। তারপর সমুদ্র। এই গ্রামে খ্রিষ্টান মিশনারিরা ঢুকেছে সেই অনেক আগেই। গ্রামের পাঁচটা হিন্দু পরিবার খ্রিষ্টান হয়েছে। মিশনারিরা গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোর দুরবস্থার দিনে অল্প কিছু সাহায্য সহযোগিতা করে তাদেরকে খ্রিষ্টান বানিয়ে নিয়েছে। প্রকৃত দুর্যোগে এদেরকে খুঁজে পাওয়া ভার।

ওখানে কয়েকটা মসজিদ আর একটা স্কুল ঘূর্ণিঝড় এর সময় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। রোজার মাসে সব পুরুষরা মসজিদেই ইফতার করে। বাড়ি বাড়ি থেকে ইফতার সংগ্রহ করে একসাথে সবাই মসজিদে খায়।

পানির খুব অভাব। টিউবওয়েলগুলো সব পানি শূন্য। নদীর পানি লোনা। বৃষ্টির পানিই শেষ ভরসা। সবাই বৃষ্টির পানি ধরে রাখার চেষ্টা করে। সরোবর এর 'পানি' প্রজেক্ট থেকে গত কিছুদিন আগে পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে দুইটি মসজিদ আর একটি মাদরাসায়। পাঁচ হাজার লিটারের পানির ট্যাংক আর মোটর জেনারেটর দিয়ে পানি উঠানোর ব্যবস্থা। ওগুলোও দেখে আসলাম। বিকেলে রওনা দিলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। পেছনে রেখে গেলাম স্মৃতিময় দুটো দিন।

কিছু শিক্ষা। কিছু উপলব্ধি;

১. প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষগুলো আসলেই কষ্টে আছে। নদীকেন্দ্রিক তাদের জীবন-জীবিকা। সুন্দরবনের পাশের গ্রামগুলোর মানুষের একমাত্র জীবিকা সুন্দরবন। মধু সংগ্রহ, মাছ ধরা তার পাশাপাশি গতর খেটে তাদের জীবিকা চলে।

২. নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে দিছে সরকার। জাল পাতলেই কোস্ট গার্ড এসে ধরে নিয়ে যায়।

৩. বনে ঢোকার পাস থাকা সত্যেও মৌয়ালিদের মাঝে মাঝে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

৪. কিছুদিন আগে করমজলে আগুন লেগেছিল। টানা তিনবার নির্দিষ্ট সময় পরপর বনে আগুন লাগত। ম্যাংগ্রোভ বনে আবার আগুন লাগে কীভাবে?

৫. রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ দেখে এলাম। পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর একটি উদ্যোগ এটা একটা বাচ্চাও বোঝে।

৬. কিছুদিন আগে সুন্দরবনে তেলবাহী জাহাজের ট্যাংকি ফেটে হাজার হাজার গ্যালন তেল পরে যাওয়ার ঘটনা নিশ্চয়ই মনে আছে? স্থানীয়রা এটাকে নিছক একটি দুর্ঘটনা হিসেবেই দেখছেন না। তারা এটাকে ষড়যন্ত্র মনে করছে।

৭. জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, জোয়ার ভাটা, বন্যার মতো দুর্ভিক্ষগুলো ঐসব এলাকার মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে ভয় নিয়ে কাটায় এলাকার মানুষগুলো।

সর্বশেষ। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষগুলোর কষ্ট দেখে এসে যখন ফেসবুকে ঢুকি, সভ্য মানুষগুলোর চলমান ইস্যুগুলো দেখে কষ্ট লাগে। আমরা কি একটু "চক্ষু" মেলিয়া দেখিবো না? সাহায্যের হাতটা কবে বাড়িয়ে দেবো?
ওপাশ থেকে উত্তর আসল, "হাত বাড়ানো যাবে না। হাতে আমার স্মার্টফোন, ল্যাপটপ।"

মেঘের ভেলায় মেঘের দেশে

মুহাম্মাদ তাসনীম হোসেন

প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততা একসময় মনকে নিস্তেজ করে দেয়। হোক না সেটা পড়াশোনা কিংবা কাজকর্ম। নিস্তেজ মনকে ফিরে পেতে সবচেয়ে বড় মাধ্যম ভ্রমণ করা। সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছালি দেখে কারনা মন ভালো লাগে। যদি এই সবুজের সাথে মেঘের ভেলায় ভাসা যায় তখন কি অবস্থাই না হয় ভেবে দেখুন তো! তাহলে আসুন মেঘের ভেলায় ভেসে আসা যাক।

সময়টা তখন ২০২২। ডিসেম্বর মাস। বাংলাদেশে এই সময়টাতে কিছু শীত থেকে যায়। সদ্য আলীম পরীক্ষা শেষ হলো। আমার সাথে আমার ক্লাসমেট আব্দুল্লাহ ভাইকে সাথে নিয়ে "চাঁদের বাড়ি" ট্রাভেলস গাইডারের মাধ্যমে

ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটির সাজেকে রওনা হই। আমাদের সাথে আরো ৪০ সদস্য। সকলেই ভ্রমন প্রিয় মানুষ। রাত এগারোটা নাগাদ বাস ভ্রমণ শুরু হয়। প্রচন্ড শীত পড়ছে। শীতের পোশাক গায়ে জড়িয়ে দুজন মিলে গল্প আরম্ভ করি। কখন যেন চোখ দুটো বুজে গেল বুঝতেই পারিনি। সজাগ হলাম ফজরের আজানে, যখন বাস নামাজের জন্য বিরতি দেয়া। অনেকক্ষন পর শরীরটা নাড়িয়ে নেয়া যাক। উঁচুনিচু রাস্তায় গাড়ি চলতে চলতে আমরা এখন খাগড়াছড়িতে। নামাজ আদায় হলে বাস আবার ছেড়ে দেয় আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায়। ভয় পেয়েছিলাম সবাই, কেমন করে এত বড় বাস দ্রুত চলে, যেখানে এত ছোট রাস্তা আবার পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গভীর গর্ত হাঁ করে তাকিয়ে আছে! তখন সাউন্ডবক্সে শুনছিলাম সূরা ইয়াসিন ও আর-রহমান। ভয়ে ভয়ে পৌঁছে গেলাম রাঙ্গামাটি। এটাই পাহাড়ি পথের শেষ বাস স্টেশন। সকালে নাস্তা শেষে মেঘের দেশের যাত্রা শুরু হলো।

এবার নতুন বাহনের সাথে পরিচয়। যা সাধারণ রাস্তায় দেখা যায় না। নাম তার "চাঁন্দের গাড়ি"। হাঁ, নামটা এমনি। এই পাহাড়ি স্টেশন থেকে সাজেক প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। আমরা যাত্রা শুরু করলাম। এখনো রোমাঞ্চকর কিছুই নজরে আসেনি। শুধু পাহাড়ি কিছু ক্ষেত খামার দেখা যাচ্ছে। চাঁন্দের গাড়ির ভিতরে আমরা। তাই পুরো ভিউ দেখতে পাচ্ছি না। এক পর্যায়ে আমরা চলে এলাম বিজিবি ক্যাম্পে। এখানে সাময়িক বিরতি। কারো খাবার-দাবার, হালকা ঘোরাফেরা, ক্যাম্প পরিদর্শন, সেলফি তোলার জন্য এ ব্যবস্থা। আমি একটি ভিডিও ডকুমেন্ট তৈরি করছিলাম। এখান থেকে আমাদের সামনে পিছনে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে মেঘের দেশ সাজেকে। বিরতি শেষ হয়ে চললাম সাজেকের পথে। সবার সামনে সেনাবাহিনী গাড়ি চলছে। আবার সবার পিছনে সেনাবাহিনীর গাড়ি। এর মাঝে কম না হলেও একশ প্লাস চাঁন্দের গাড়ি, প্রাইভেট কার, বাইক রয়েছে। এবার মোটামুটি পাহাড়ি ভ্রমণের ফিল পাওয়া যাচ্ছে। সচরাচর চাঁন্দের গাড়ির ছাদে কাউকে বসতে দেয় না। আমরা ড্রাইভারকে ম্যানেজ করে গাড়ি থামালাম। এবার আমরা চাঁন্দের গাড়ির ছাদে চড়ে বসলাম। শুরু হলো অ্যাডভেঞ্চার। পাহাড়ের উঁচু নিচু দেখে যে কেউই ভড়কে যাবে। একবার উপরে উঠি একবার নিচে নামি। মনে হয় এখনই গর্তে পড়ে যাব। এক পাশের উঁচু রাস্তা থেকে অপর পাশের উঁচু রাস্তা দেখলে মনে হয় যেন সোজা হেঁটে হেঁটে উপরে উঠছি। আমাদের সঙ্গীরা সবাই

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ কেমন সৃষ্টি। এ কেমন গাছ-গাছালি তরুলতায় আবৃত একটি অঞ্চল। কে এর সৃজনকারী। এ কেমন দৃষ্টিনন্দনা আকর্ষণ। কেমন মায়া জড়ানো এই দৃশ্যগুলো। কবির কবিতা, লেখকের লেখা যেখানে থমকে দাঁড়ায়। আব্দুল্লাহ ভাইকে বললাম এ কেমন দৃশ্য! আল্লাহু আকবার যে কতবার বলেছি তার শেষ নেই। আবার এত ভয় পাচ্ছি যে, তারও শেষ নেই।

আমাদের এক সঙ্গী পুরো পথের ভিডিও ধারণ করে। আমরা তাকে আগলে রাখি। যদি একবার হাত ফস্কে যায় তাহলে নিশ্চিত এক্সিডেন্ট হবে। বুকে অনেক সাহস নিয়ে চাঁন্দের গাড়ির ছাদে চারপাশ অবলোকন করছি। প্রায় ৩০ কিলোমিটার শেষ হয়ে গেল। এখন একটি যাত্রা বিরতি। এখানে একটি ছোট্ট জলাধার রয়েছে। এখান থেকে সাজেকের হোটেলগুলোতে পানি সরবরাহ করা হয়। এখানে দশ মিনিট যাত্রা বিরতির পর আবার যাত্রা শুরু হয়। বরাবরের মতো আবারো ছাদে আরোহণ করি। তবে এই অংশটুকু আরো রোমাঞ্চকর ছিল। পূর্বের তুলনায় এবারের পাহাড়ের উচ্চতা আরও বেশি। একটি চমৎকার দৃশ্য সামনে আসে। সাজেকের আসার পথে পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা আমাদের গাড়ির দিকে হাত উঁচু করে হাত নাড়ায়। আমরাও হাত নাড়িয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে সামনে চলি। সাজেক রাঙ্গামাটির ওই অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু অঞ্চল। এবার যেন গাড়ি খাড়া হয়ে উঠছে! ভয়ে ভয়ে চলে এলাম সাজেকে। গাড়ি আমাদের হোটেলের সামনে থামে। এখন হোটেলে উঠে ফ্রেশ হবার পালা। গোসল করে জোহরের নামাজ শেষে লাঞ্চ করি একসাথে। সাজেকের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার হলো বাঁশের ভেতর মুরগির মাংস রান্না। লাঞ্চ শেষ করে চারপাশটা আমরা ঘুরে দেখি। চারপাশের বিভিন্ন পণ্যের বিতানগুলো খুবই সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে। হোটেলের কারুকাজ খুবই চমৎকার। যে কেহই মুগ্ধ হবে। এমনভাবে সাজানো যে, বারান্দায় দাঁড়ালে মনে হবে শূন্যে ভাসছে।

দেখতে দেখতে বিকাল গড়ায়। এখন আমাদের যাত্রা কংলাক পাহাড়। যেটা সাজেকের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। চাঁন্দের গাড়িতে চড়ে আমরা কংলাক পাহাড়ের কাছে চলে আসি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। হালকা ঠান্ডা মৃদু বাতাস বইছে। এর মাঝেই চলল আমাদের গাড়ি। কংলাক পাহাড়ের কাছে চলে আসলাম। পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা পাহাড়ে ওঠার জন্য বাঁশের কঞ্চি ভাড়া দিচ্ছে। প্রতি পিস ১০ টাকা করে। আমি

একটা কিনে নিলাম। আমাদের সকল সদস্য কিনে নিল। এবার পাহাড়ে আরোহন শুরু করলাম। পাহাড়ে ওঠা আসলেই কষ্টকর। বাঁশ দিয়ে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে উপর দিকে উঠছিলাম পাহাড়ের গা ঘাসে। চোখ তোলার মত একটি দৃশ্যে আটকে গেলাম। আমাদের এত কষ্ট করে উপরে উঠতে হচ্ছে অথচ পাহাড়ি বৃদ্ধারা এক ঝুড়ি মাটি মাথায় ভর নিয়ে উপরে উঠছে। তাদের কোন কষ্টই হচ্ছে না। আবার বৃদ্ধা! বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে হয়ত! কংলাক পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে প্রায় ত্রিশ মিনিট লেগেছে। পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে বাঁশের তৈরি পেয়ালা ,কাপ, গ্লাস নিয়ে বসে আছেন পাহাড়ি মহিলারা।

পাহাড়ি অঞ্চলে তাদের নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাদের ঘরে নারীরাই প্রধান। নারীরাই চাষাবাদ, ব্যবসা করে থাকে। পুরুষরা ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে, কাজের ফাঁকে তারা গান গায়। ওইটা একটা ভিন্ন জগত। আমরা পৌঁছে গেছি সাজেকের সর্বোচ্চ চূড়ায়। সূর্যটা প্রায় ডুবে যাচ্ছে। আমরা কিছু ছবি ধারণ করলাম। এত চমৎকার বলাই যাচ্ছে না। মাগরিবের আজানের সময় আমরা পাহাড় থেকে নেমে যাই। নামাজের জন্য সেখানে চমৎকার একটি মসজিদ রয়েছে। যা চোখ জুড়িয়ে দেয়। নামাজ শেষে আমরা হেলিপ্যাড এ আসি। সেখানে বিভিন্ন দলে লোকজন গান গাইছে মজা করছে। এর পাশে বিশাল খাবারের দোকান। কাঁকড়া, চামচা , পেঁয়াজু, আলুরচপ, বেগুনি পাওয়া যায়। হাঁটাহাঁটি করতে করতে রাত নয়টা বেজে যায়। ডিনারের আয়োজন ছিল বারবিকিউ আর নান রুটি। ডিনার শেষে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। মেঘের ভেলায় তো উড়তে হবে নাকি!!

ভোর এখন ৫:৩০। ফজরের আজানা হয়নি। ঘুম থেকে উঠেই বারান্দায় এসে দাঁড়াই। দেখলাম আমাদের নিচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সাদা সাদা তুলা রাশি রূপে মেঘ ঘিরে রেখেছে চারপাশ। হাত দিয়ে ধরা যায়। মেঘের উপরে চাঁদ মামা উঁকি দিয়ে আছে। ফজরের নামাজ শেষে বাহিরে নামলাম। মানুষ সাজগোজ করে মেঘের ভেলায় হাঁটতে বের হচ্ছে। শুধু রাস্তা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে যে পাহাড় সেটাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু সাদা আর সাদা। এতই চমৎকার। আমরা কিছু ফটো তুললাম। আব্দুল্লাহ ভাইকে বললাম এ কেমন দৃশ্য হে! তিনি বললেন এটাই তো রোমাঞ্চকর সৃষ্টি। এটাই তো আমাদের দেশের সৌন্দর্য। হাঁটতে হাঁটতে হেলিপ্যাডে চলে আসে।

তখন সূর্যীমামা কিছুটা উঁকি দিচ্ছে। সূর্যীমামার সোনালী আলোতে মেঘের ভেলা এত চমৎকার দেখাচ্ছে যার বিশ্লেষণ হয় না। যদি কেউ সেখানে না যায় তাহলে বোঝানো মুশকিল। প্রায় সকাল ৭টা পর্যন্ত আমরা মেঘের বেলায় আরোহন করতে থাকি। এবার আমরা গেলাম লুসাই গ্রামে। এটা পাহাড়ি একটা গ্রাম। গ্রামে প্রবেশ করতে হলে টিকিট কাটতে হয়। ভিতরে পাহাড়ি মানুষের বিভিন্ন সৃজনশীল কর্ম দক্ষতা দেখানো হয়। গাছের উপরে বাড়ি সেটা সেখানেই দেখতে পাওয়া যায়। কি চমৎকার না দৃশ্যগুলো। দেখতে দেখতে সকাল ১১টা বেজে যায়। সকালের নাস্তা সারালাম। এবার যাওয়ার পালা। জোহরের নামাজ পড়ে আবারো চাঁন্দের গাড়িতে করে রওনা হই। এখানে আমার চমৎকার একটি অভিজ্ঞতা হলো, চলন্ত গাড়িতে ছাদে ওঠা। যা আমাকে এখনো ভাবায়!

আহ! যদি থেকে যেতাম আজীবন মেঘের দেশে। এবার সাজেকের মেঘের ভেলায় ভেসে ভেসে সুন্দর মনোরম পরিবেশ অবলোকন করে ফিরছি আপন ঠিকানায়।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,চট্টগ্রাম।
এ কে খান, চট্টগ্রাম।

দ্য গ্র্যান্ড দাদুবাড়ি

জাবের আব্দুল্লাহ

হেমন্তের সূর্য তেতে উঠেছে, তবুও যেন চারিদিক ল্যাম্পপোস্টের নিয়ন আলোর মতোই কোমল- মলিন। আকাশের বিশাল নীলিমায় স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে। উত্তরাঞ্চলের এই এলাকা হিমালয়ের প্রতিবেশী হওয়ায় সারা বছরই গাছের ডগায়, পাতার ফাঁকে বিন্দু বিন্দু শিশির জমে। সূর্যের সোনালি আভায় সেগুলোকে মুক্তো বিন্দু বলে ভ্রম হয়। পাগলু নামের অদ্ভুত গাড়িতে করে এসে আমরা নামলাম দাদুবাড়ির গেইটে। পথজুড়ে নাতিশীতোষ্ণ এই পরিবেশ আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

সকালের নাশতা শেষে যখন পরামর্শে বসেছিলাম সব কাজিনরা, তখন দীর্ঘ বাগ্‌বিতণ্ডার পর ভিন্ন জগৎ, স্বপ্নপুরী, রামসাগর, এমনকি হিমালয় কন্যা কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশ ডিঙিয়ে স্থির হয়, আমরা এবার দাদুবাড়িতে যাচ্ছি। এই দাদুবাড়ি ছেলেবেলার উচ্ছল জীবনের আনন্দ, ভুলে যাওয়া গল্পের মতন ধূসর স্মৃতির ঠিকানা, কিংবা আমাদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরা ভিটেমাটি নয়। এটা আসলে একটা পার্ক, রিসোর্ট ও পিকনিক স্পট। গেইট ঘিরে পাতাবাহার দিয়ে সুন্দর ডিজাইনে লেখা 'দ্য গ্র্যান্ড দাদুবাড়ি'। গেইট ছেড়ে টিকিট কাউন্টারে গিয়ে অবাক হলাম। একশত টাকার বিনিময়ে লোকটা আমাকে একটা টিকিট আর সুলতানি আমলের দিনারের মতো সোনালি একটা কয়েন দিল। লক করা গেইটে সেই কয়েন ঢুকাতেই সেটা খুলে গেল। কয়েন দেখেই বুঝেছিলাম এই স্পটটা আধুনিক মানের। ভেতরে ঢুকে আমরা সবাই-ই বিস্মিত হলাম। পার্কের এরিয়া ঘিরে রেখেছে টলটলে জলের আঁকাবাঁকা বিশাল লেক। তার ওপর ঝকঝকে কাচের ব্রিজ। একটু তফাতে বিশ্ব মানচিত্র আঁকা ফোয়ারা। সবখানে আধুনিকতার ছোঁয়া। রাস্তার দু'ধারে বিচিত্র গাছগাছালি, রংবেরঙের ফুল-লতাবাহার, হিজল, পাইনসহ নাম না জানা অচেনা আরও কত কী!

লেকের ধার ঘেঁষে বিচিত্র লতায় ঘেরা আসনগুলো, সেখানে বসলে মনটা জুড়িয়ে যায়। শীতল হাওয়ার মৃদু স্পর্শে, পাখিদের কলধ্বনিতে, আর পাতাদের মর্মরে হেমন্তের নীরব সুর ধ্বনিত হয়। শহরের পোড়াবালিতে হাঁপিয়ে ওঠা মনে বারবার মনে হয়, যেন প্রকৃতির পরম ভালোবাসার ছোঁয়া পাচ্ছি।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো পার্কটা আশ্চার্যরকম নীরব ও নিরিবিলি। অনেকগুলো মানুষ, তবুও ঝিমধরা দুপুরের মতন নিঝুম, শান্ত। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কুলকুল রব শুনে থমকে দাঁড়ালাম। ঘন-নিবীড় লতার ফাঁকে দেখলাম বিশাল ওয়াটার গ্যালারি। অসাধারণ সব ঘাস-পাতার ফাঁকে নল লাগিয়ে কৃত্রিম প্রস্রবণ সৃষ্টি করা হয়েছে। গ্যালারি জুড়ে সবুজের ছড়াছড়ি। কোণের নির্জন একটা আসন দেখে আমি বসলাম। মুহূর্তে সামনের স্বচ্ছ পুকুর, টলটলে জল, অসীম নীলাকাশ আর হাজারটা নলের বিরতিহীন জলের সশব্দ সুর-ছন্দে আমি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলাম। দীর্ঘক্ষণ ধরে মূক হয়ে থাকলাম প্রকৃতির মাঝে। সবুজের দেশে। তবুও যেন আশ মেটে না।

সুইমিং পুল, মসজিদ, পার্ক, বাগান সব মিলিয়ে সে এক স্বপ্নময় ভুবন। স্বর্গরাজ্য।

আধুনিকায়ন আর সবুজের ছন্দমিল যেন অপার্থিব আবহ সৃষ্টি করেছে সেখানে। এ ধরনের প্রাকৃতিক স্পটগুলো যেন আধুনিক পৃথিবীতে আদিম যুগের নমুনা। আমাদের শহুরে জীবনের মরু উদ্যানে এক ছায়াবীথি গাছ।

আমার ফিরে আসতে মনে চায় না। তবু আসরের পর যখন আমরা বেরিয়ে আসি, তখন চারিদিকে কাকের পাখার মতো সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। পেছনে ফিরে তাকালে মায়া হয়, তাই তাকালাম না। তবে ভেতরে-ভেতরে অদ্ভুত একটা কষ্ট হতে থাকল। প্রিয় মানুষকে ছেড়ে আসলে যেমন হয়, ঠিক তেমন।

অবশেষে আমাদের ‘পাগলু’ স্টার্ট নিল। আমরা চললাম নাড়ির টানে। পেছনে পড়ে থাকল একটা শুভ-ক্ষণের স্মৃতি। বিশাল আকাশের মাঝে এক গুচ্ছ সবুজের জন্য তীব্র হাহাকার। অচেনা ভালোবাসা।

ছাত্র, জামিয়াতুল আবরার রাহমানিয়া,
মোহাম্মদপুর ঢাকা।

সাগরকন্যা কুয়াকাটা: সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্বর্গ

জুবাইর আল হাদী

মানুষের জীবনে আনন্দ উপভোগ করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ভ্রমণ। ভ্রমণ আমাদের মনে যেমনিভাবে আনন্দ দেয়, তেমনি জ্ঞানের পিপাসা মিটায়। অজানাকে জানায়, অচেনাকে চেনায়। মহানবী সা.-এর বাণীতে উপস্থিত, জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে সুদূর চীন দেশে যাবার আহ্বান। ধর্মীয় মহাপুরুষদের পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে বা মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেছেন। এসব কিছুর সঙ্গে আছে আনন্দ আর জ্ঞান-পিপাসা।

দাখিল (SSC) পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে আমার জীবনে ছোট একটি আনন্দ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। আমার কাছে এটি 'আনন্দ ভ্রমণ' নয়; শিক্ষা সফর। শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগের ইচ্ছা থাকলে হয়তো আনন্দ উপভোগই হয়, কিন্তু শেখার উদ্দেশ্য থাকলে শেখার সাথে সাথে আনন্দও হবে।

ঈদের দিন রাতে আমাদের মহল্লা থেকে একটি বাস ছেড়ে যাবে কুয়াকাটার উদ্দেশে। সিদ্ধান্ত হলো, আমরা ঐ বাসেই যাব। আমরা চারজন। আমি, আম্মু ও আমার ছোট জমজ দুই ভাই জাবির এবং জারির।

আমরা যাব পিরোজপুর থেকে। বাস ছেড়েছে রাত সাড়ে এগারোটা। লটারির মাধ্যমে সিট নির্ধারণ হওয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসতে হয়েছে আমাদের। সিট নিয়ে কাড়াকাড়ি হওয়ার কারণে বাস-

কর্তৃপক্ষ এ-ই ব্যবস্থা করেছেন হয়তো। বাসে টাইম-পাস করার জন্য সাথে নিয়েছি 'কিশোরকণ্ঠ'র ঈদ সংখ্যা ২০২৪।

বাস চলছে খুলনা-বরিশাল সড়ক দিয়ে, ঝালকাঠি গাবখান সেতু পারিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে। আর দুটো মোর ঘুরলে দেখা যাবে পরিচিত একটা গেইট। যেখানে আমার কেটেছে স্মৃতিময় কতদিন! ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদ্রাসা। গেটের সামনে দিয়ে যখন বাসটি যাচ্ছিল, তখন চোখের পাতায় সকল স্পষ্ট স্মৃতি হয়ে হৃদয় হাহাকার করে উঠলো। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কিশোরকণ্ঠ পড়লাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম, তা খেয়াল নেই।

ঘুম ভেঙে গেল গাড়ির ঝাঁকুনিতে। পকেট থেকে ফোন বের করলাম। রাত চারটা বাজে। ডাটা কানেকশন দিয়ে গুগল ম্যাপে প্রবেশ করে দেখলাম, আমরা কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের খুব কাছে। কাছে বললে ভুল হবে, বলা যায়; সাগর পাড়ে। কারণ আমাদের গাড়ি চলছে বেড়িবাঁধের ওপর দিয়ে। গাড়ি হেলেদুলে চলার কারণে বোঝাই যাচ্ছে, রাস্তা কিছুটা উঁচুনিচু। বেড়িবাঁধের ওপর দিয়ে কিছুটা পূর্বে যাওয়ার পরে গাড়ি থামল কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যানের অদূরে নাহিয়ান চত্বরে।

ওদিকে মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের মধুরকণ্ঠে ভেসে আসছে 'আস-সলাতু খইরুম-মিনা-ন্নাউম'। মাম-পটের পানি দিয়ে অযু সেরে নিলাম। অযু তো হলো, এবার মসজিদ? গুগল ম্যাপেও আশপাশে কোনো মসজিদ শো করছে না। একটি দেখা যাচ্ছে, তাও আবার প্রধান স্পটের (জিরো পয়েন্ট) কাছে। যা এখান থেকে প্রায় দেড়-কিলোমিটার পশ্চিমে। দেরি না করে ব্যাগ থেকে গামছা নিয়ে বিছিয়ে দিলাম ঘাসের উপর। এবং সেখানেই আদায় করলাম ফজরের সালাত।

পূর্ব দিগন্ত ফর্সা হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্যোদয় হবে। আমার ভাবনায় এলো, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সবকিছু মানবজাতির জন্য কত সহজ করে দিয়েছে! সেখানেও আল্লাহ তায়ালা সহজ ভাষায় বলেছেন এই সূর্যাস্তের কথা (সুরা কাহাফ, আয়াত-৮৬)। আল্লাহ তায়ালা যদি সূর্যাস্তকে এভাবে বলতেন যে, 'পৃথিবীর গোলার্ধের যে অংশে জুলকারনাইন (কুরআনে বর্ণিত), সে অংশটা সূর্যের ঠিক বিপরীতে অবস্থান করবে।' তাহলে শুনতেও কেমন কঠিন এবং বিব্রতকর লাগত। কিন্তু মহান আল্লাহ এটাকে সহজ ভাষায় 'সূর্যাস্ত' বলেছেন, যাতে কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বিজ্ঞানী বা সাধারণ মানুষ সবাই বুঝতে পারে। সুবহানাল্লাহ।

কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান। এখন থেকেই আমাদের সমুদ্র সৈকতের যাত্রা শুরু হলো। কুয়াকাটার পর্যটকদের বিনোদনের উৎস ছিল 'কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান'। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আইলা, আম্ফান, ইয়াসের মতো ঘূর্ণিঝড়ে উদ্যানের মূলগেট ছাড়া তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে একে একে সব।

২০০৫ সালে কুয়াকাটা জিরো পয়েন্ট থেকে দুই কিলোমিটার পূর্বে এক হাজার ৬১৩ হেক্টর জায়গা নিয়ে কুয়াকাটা ইকোপার্ক নির্মিত হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১০ সালের ২৪ অক্টোবর পার্কটিকে 'কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এতকিছু আমি আগে জানতাম না, গেটের অদূরে এক দোকানির কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি অনেক কিছু বলেন। তিনি আরও বলেন, 'উদ্যানের অন্যতম সৌন্দর্য ছিল ঝাউগাছ। এছাড়াও সুন্দরী, হিজল, করমজা, অর্জুন, বাইন, আসামলতা ও স্বর্ণলতা ইত্যাদি প্রজাতির বৃক্ষ নজর কাড়ত।'

বীচ ধরে হাঁটছি পূর্ব দিকে। উদ্দেশ্য সূর্যোদয় দেখা। কিন্তু বর্তমানে এপ্রিল মাস, নভেম্বর বা ডিসেম্বর হলে এখানে বসে-ই দেখা যেত। কারণ, তখন সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করে, অর্থাৎ সূর্যটা আমাদের থেকে কিছুটা দক্ষিণ দিকে দেখা যায়। আর সমুদ্র সৈকতের ফাঁকা দিকটাও দক্ষিণ দিকে।

মনে হচ্ছিল, ঝাউবন পেরোতে পারলেই সূর্যোদয় দেখা যাবে। কিন্তু ঝাউবন পার হয়ে আমাদের ভুল ভাঙল। এখনো অনেক পথ। সবাই মোটরসাইকেল, ভ্যান, ইত্যাদিতে পূর্ব দিকে ছুটছে। বাধ্য হয়ে আমরাও গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু কাজের কাজ হলো না, গাড়ি চলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম; সূর্যিমামা গাছের ফাঁক থেকে উঁকি মারছে। তাই আর সামনে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম না।

এখানে একটি নদীর মোহনা। কিন্তু নদীর নাম কী, তা জানা হলো না। বীচ অনেক প্রশস্ত। অনেক দূরে মানুষ দেখা যাচ্ছে। বোধহয় এখন ভাটা। সকালের নাস্তার জন্য আমরা চারজনে একটি ছোট্ট হোটেলে প্রবেশ করলাম। সাধারণ দোকানে যা থাকা অবশ্যক, এখানেও তার বেশি নেই। দাম জিজ্ঞেস করতেই আমি অবাক! সকল পণ্যের দাম প্রায় দ্বিগুণ। শুধু রুটি-কলা দিয়ে নাস্তা করলাম। সকাল আটটার মধ্যে আমাদের ঘাটিতে পৌঁছাতে হবে। তাই এখানে আর

দেরি না করে যেদিক থেকে এসেছি, সেদিকেই হাঁটা শুরু করলাম।

অনেক গাছ সাগর পাড়ে শুকিয়ে পড়ে আছে। গাছের নিচের বালু সরে গেলে আর দাড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় না, তাই গাছগুলো বীচের বালুতে পড়ে থাকে। সাগর ঘেঁষে কী বিচিত্র সব গাছের বিচরণ। যা আমি আগে কখনো দেখিনি। এ-সব মনোমুগ্ধকর গাছপালা দেখতে দেখতে চলছি পূর্বের গন্তব্যে, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে। খোলা বীচ দিয়ে তাকালে মনে হয়, অল্প কিছুদূর বাকি। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, পথ শেষ হচ্ছে না।

প্রায় দেড় ঘন্টা হাঁটার পরে আমরা যখন আমাদের শিবিরে এসে পৌঁছালাম, তখন সকাল ১০টা বেজে গেছে। সকালের খাবার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে ভুনা খিচুড়ি। খাবারের সব উপকরণ বাসে করে নিয়ে আসায় আমরা কোনো হোটেল বুকিং করিনি। বেড়িবাঁধের উপর অস্থায়ী চুলা তৈরি করে সেখানে খাবার রান্না হয়েছে। আমাদের স্থানীয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন পঞ্চাশোর্ধ এক বৃদ্ধ। তাঁর পরিবার থাকে এখন থেকে দু কিলোমিটার দূরে। বেড়িবাঁধের পাশে তাঁর ভিটে বাড়ি, এটাই সে দেখাশোনা করেন। খাবার পানি থেকে শুরু করে নামাজ পড়ার জন্য জায়গা; সকল বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন তিনি।

নাস্তা করে আমরা চারজন (আমি, ছোট দুই ভাই; জাবির ও জারির এবং আম্মু) বৌদ্ধ বিহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সকালে দেড়ঘণ্টা হাঁটার পরে আমাদের আর হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না, তাই একটা ভ্যানে উঠলাম। ভ্যান গিয়ে থামলো পিছনের গেইটে। ভিতরে প্রবেশ করতে হলে ১০ টাকা দিয়ে টিকিট নিতে হয়। টিকিট নিয়ে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ পথের বাম পাশে একটা ছোট্ট কুয়া চোখে পড়ল। গোল করে বাঁধানো, উপরে লোহার পাইপ দিয়ে বেষ্টিত, পাকা ছাউনি। কুয়ার দেয়ালে লটকানো কাগজে লেখা, '১৭৮৪ সালে আদিবাসী রাখাইনরা খাবার পানির জন্য এই কুয়া তৈরি করেন।' বাহিরে জুতা রেখে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের জুতা এককোণে রেখে ছোট্ট একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। ডান পাশে একটি ঘর। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ১৪-১৫ বছর বয়সী কয়েকজন কিশোর, নিজস্ব ভাষায়। একজন এসে টিকিট নিয়ে গেলো আমার কাছ থেকে। ঘরের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ ফাঁকা। দু'পাশে সোফা, সোজা পশ্চিম পাশে বিশালাকার বৌদ্ধ মুর্তি। সোনা, রূপা, তামাজাতীয় ধাতব পদার্থ থেকে ১৯২৪ সালে এটি তৈরি করা হয়। উচ্চতা ছ'ফুট। কক্ষটি থেকে বের হওয়ার সময় চোখে পড়ল দেয়ালের সাথে হোয়াইট বোর্ডে কিছু লেখা। সামনে বই খাতা রাখা। বুঝতে পারলাম যে, গেইটে এবং

বারান্দায় থাকা কিশোরদের পড়াশোনা করানো হয় এখানে।

বৌদ্ধ বিহার থেকে বেরিয়ে একটি টল-ঘর চোখে পড়ল। ফটকের কপাট নেই। অর্থাৎ সবার জন্য উন্মুক্ত। ভিতরে একটা ছোট পাল তোলা জাহাজ। বেশ পুরনো। একপাশ প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কাঠগুলো অনেক পুরু। মাঝে মাঝে লোহা খসে পড়েছে। জাহাজের অন্য পাশে প্রকাণ্ড এক শিকল। হালকা মরিচাধরা। দেয়ালের পাশে সাইনবোর্ড। এই সাইনবোর্ডের লেখা পড়ে জাহাজটি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারলাম।

সাইনবোর্ডের লেখা পড়ে একপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম পুরাতন জাহাজটির দিকে। সংবিৎ ফিরে পেলাম আম্মুর ডাকে। একটু কড়া গলায়ই বলল, 'সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। আজ যে শুক্রবার, তা খেয়াল আছে? জুমার নামাজ আদায় করতে হবে না!'
আরে, হ্যাঁ তো! এখন পর্যন্ত গোসলই করিনি।

সাগর পাড়ের বালুময় পানিতে তিন ভাই বেশ কিছুক্ষণ দাপাদাপি করলাম। মানুষ গোসল করে পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের শরীরে বলুতে চিকচিক করছে। এখন পরিষ্কার হওয়ার জন্য ভালো পানি দিয়ে আবার গোসল করতে হবে। পাবলিক টয়লেটের পাশের গোসলখানায় গোসলের জন্য জনপ্রতি পনেরো টাকা। টাকা বাঁচানোর জন্য আমাদের সাহায্যকারী বৃদ্ধের পুকুরে দ্বিতীয়বার গোসল করলাম। মসজিদে গিয়ে খতিব সাহেবের আলোচনায় একটুও মন দিতে পারলাম না। ঝিমঝিম ভাব।
নামাজ আদায় করে বাসে (আমাদের ঘাঁটি) ফিরে দেখি, দুপুরের খাবার রেডি। আম্মুসহ কয়েকজন মহিলা নামাজ পড়তে গিয়েছে বৃদ্ধের ঘরে। আমি অবাক হলাম বৃদ্ধ চাচার আচরণ দেখে। তাকে আমরা চিনি না, জানি না। কিন্তু সে আমাদের জন্য তাঁর কুঁড়ে ঘরখানা মুক্ত করে দিয়েছেন।

খাবারপর্ব শেষ করে অল্প কিছুসময় বিশ্রাম নিল সবাই। তারপরই শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন খেলা এবং প্রতিযোগিতা। হাঁড়ি ভাঙা, হাডুডু, দৌড়সহ আরও অনেক রকম খেলা। সবশেষে পুরস্কার বিতরণী। আসরের নামায পড়ে আবারও বের হলাম সাগর পাড়ে। বিকেলের আবহাওয়াটা বেশ মনোরম। রোদের তেজ কম, ফুরফুরে বাতাস। ঝপাৎ ঝপাৎ করে

আছড়ে পড়ছে ছোট ছোট ঢেউ। আকাশ মিনিটে মিনিটে রং পাল্টাচ্ছে। এসব মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সূর্যিমামাও বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে।

মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম কুয়াকাটা সাগর সৈকত জামে মসজিদে। মসজিদ থেকে বের হয়ে একটি দোকানে বাদাম জাতীয় খাবার ক্রয় করছিলাম, এমন সময় ভোঁ ভোঁ করে ফোনটা বেজে উঠল। আমাদের ড্রাইভারের নম্বর। রিসিভ করার সাথে সাথেই বললে উঠলেন,'অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বাস ছেড়ে দেয়া হবে। তাই আপনারা যেখানেই থাকেননা কেন, দ্রুত চলে আসুন।' আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। বাস ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিলো রাত নয়টায়। তাহলে কি আমার এ-ই সাগরপাড়ে রাতের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা হবে না!

বাসের কাছে গিয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে, মুখ ভার করে। কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বিদায়ী মুসাফা করলাম। কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল বৃদ্ধ চাচা। কিন্তু পিছন থেকে জারির বলল, 'ভাইয়া, তারাতাড়ি আসো। বাস ছেড়ে দিচ্ছে।' আর শোনা হলো না তাঁর কথা। নামটা পর্যন্ত জানতে পারলাম না। বাসে উঠে দেখলাম, বৃদ্ধ চাচা মলিন চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। বাস চলতে শুরু করেছে। বৃদ্ধ চাচার থেকে দূরত্ব বাড়তে বাড়তে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সম্পাদক, কিশোর দুরন্ত

ইতিহাসের গলি বেয়ে পুরান ঢাকার মসজিদ

রাহিল

পুরান ঢাকা বলতেই দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে, অবিস্তৃত এলাকার সমাবেশ; রাস্তাগুলো সরু, যেখানে বহুলোকের আবাস। এখন এমন মনে হলেও তা পূর্বে ছিল ছিমছাম, সাজানো এক শহর। একেকটা বাড়ি ওদের পূর্বসূরীদের স্মৃতি

বহন করে। ওরা খুব চালাক-চতুর আর ব্যবহারে অমায়িক। সারা বিশ্বেই সুপরিচিত এ শহর। বাংলাদেশের প্রধান কেন্দ্র তো বটেই, এটা মসজিদের শহর হিসেবেও প্রসিদ্ধ। ইতিহাস এর প্রাচীন, এ খ্যাতি অর্জিত হতে লেগেছে যথেষ্ট সময়।

শুক্রবার; বের হয়েছি সেসব মসজিদের সন্ধানে, যেগুলো শতাব্দীকাল ধরে বহন করছে নিজ ইতিহাসের স্বাক্ষ্য। আমার মূল উদ্দেশ্য এটা হলেও হাসান আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে অন্য এক লক্ষ্যে, যদিও পুরো ব্যয়ভার ওর। জুমা পড়ার জন্য শতাব্দীপ্রাচীন মসজিদই আমাদের বাঞ্ছনীয় ছিল। তবে হাসানের কথায় বায়তুল মুকাররমে প্রবেশ করলাম। বেশ প্রফুল্ল লাগছিল তাকে। কারণ, ছোটবেলায় এ মসজিদে আসত সে, বহু বছর পর এসেছে আজ।

১.

চল, আমরা পুরান ঢাকার দিকে যাই–হাসানকে বললাম। হাসান রাজি হলে গুলিস্তান পেরিয়ে বংশালের রাস্তা ধরে দু'জনে এগোতে থাকলাম। একটা গলি, আর সামান্য ব্যবধানে এত এত মসজিদ! এজন্যই কি ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের শহর? একেকটা মসজিদ কি বিশাল বিশাল! এত লোকই-বা কোথায় থাকে?

আমরা বড় গলির বামে আরো সরু এক গলিতে ঢুকলাম। এটা কাশ্বাবটুলী এলাকা। এ চিকন গলিতে এত মানুষ, বাড়িঘর! সেই একই অবস্থা, মসজিদের সংখ্যাও কম নয়। এ এলাকায় 'চিনির মসজিদ' নামে প্রসিদ্ধ এক মসজিদে প্রবেশ করলাম। বাহির থেকে পুরোনো আমলের কারুকার্য দেখে অবাক হচ্ছি। ভিতরে ও বাইরের দেয়ালসহ সম্পূর্ণ জায়গায় চিনিটিকরি পদ্ধতির মোজাইক দিয়ে নকশা করা। নামাজ শেষ হয়েছে আরো আগেই। তবে বেশ কয়েকজন মুরব্বীকে দেখা যাচ্ছে বসে কি যেন আলোচনা করছেন। পূর্ব পাশে ছোট হাউস, দক্ষিণে একটা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা। মসজিদের ধাঁচ ভিন্ন, দু'দেয়াল পার হয়ে মেহরাব; দুই কাতার বিশিষ্ট সারিবদ্ধ তিনটি কক্ষ! অন্ধকারের কারণে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না মেহরাবটা। তাছাড়া এর কেঁচি গেইট ও থাই দরজায় তালা দেয়া।

একটু পর বয়স্ক এক লোক এলে তাঁর পিছনে পিছনে মেহরাব কক্ষে ঢুকলাম। কি সুন্দর এর গঠন শৈলী! আমি জিজ্ঞেস করলাম,

-চাচা, এ মসজিদ তো অনেক পুরোনো, এর নির্মাণ সাল কত?

-হ হাঁচাই কইচ, আমরা হেই ছোটকাল থেইকা এনে আছি। বাইরে লেখা আছে উনিসসো সাল কত যেন। এমনই অইব, দেইকা আহ গিয়া। তোমরা কি এ মসজিদ দেখার লাইগা আইছনি? দেহ, দেহ, লগে সবি-টবি তুইলাও নিও।

পুরো মসজিদ ঘুরে দেখে বেশ মুগ্ধ হলাম। মূল বৈশিষ্ট্যই যেন, 'চিনিটিকরির কারুকাজ'। এরপর বের হয়ে সামনে চলে এলাম। বিশাল দেয়ালজুড়ে এর কারুকার্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা যে কাউকেই বিস্মিত করবে। নিচে রাস্তার সাথে লাগোয়া এর নামফলক ও স্থাপন সাল- 'কাস্বাবটুলী জামে মসজিদ, স্থাপিত ১৩৩৮ হিজরী'। ছাদবিহীন এ মসজিদের প্রতিটি পিলারের মাথায় গম্বুজ। মূল অংশের ছাদে তিনটি গম্বুজ, মাঝের গম্বুজটি বড় আর দু'পাশে মাঝারি। এছাড়া চার কোণায় একই ধরনের কারুকাজের চারটি বুরুজ। মসজিদটি ১৯০৭ সালে নির্মিত হয়। ১৯৭৯ সালে কারুকার্যে কোন পরিবর্তন না করে মসজিদটি সংস্কার করা হয়।

২.

এবার চকবাজারের দিকে হাঁটতে লাগলাম। আরমানিটোলা এলাকার আবুল খায়রত রাস্তা ধরে চলার সময় অসংখ্য মসজিদ ও পুরোনো বাড়ি চোখে পড়ল। এখানে 'একশ টাকা'র নোটের ওই 'তারা মসজিদ'টা অবস্থিত। এটাও রাস্তার পাশে এক সরু গলির ভিতর। দুপুরের কড়া রোদ মাথার ওপর। আমরা মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

এ মসজিদের গঠনও কাশ্বাবটুলীর মতো, মোঘল স্থাপত্য শৈলীর প্রভাব রয়েছে এতে। প্রবেশের পর মাঝে দু'দেয়াল পেরিয়ে মেহরাব। পুরো মসজিদের দেয়াল জুড়ে অসাধারণ নকশা, বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তারার শিল্পকর্ম; গম্বুজসহ দেয়ালগাত্রে অসংখ্যা তারা। এজন্যই এর নামকরণ হয় 'তারা মসজিদ' হিসেবে। নকশা করা এই পদ্ধতির নাম 'চিনি টিকরি'।

ঘুরে ঘুরে দেখার পর এক জায়গায় বসে গেলাম। মসজিদের গায়ে এর নির্মাণ-তারিখ খোদাই করা ছিল না। আদিতে মসজিদটি ছিল তিন গম্বুজঅলা, পরে সংস্কারের সময় পাঁচ গম্বুজ করা হয়।

৩.

আরমানিটোলার রাস্তা অতিক্রম করে চকবাজারের রাস্তায় ঢুকলাম। মোড় থেকে শায়েস্তা খানের মসজিদটা দেখা যাচ্ছে। আশপাশের আধুনিক সভ্যতার

দাপটে বোঝার উপায় নেই, মাঝের মসজিদটি শতাব্দীপুরানো। সবাই ডাকে 'চক মসজিদ' নামে।

এতটা পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে আমরা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য ছোট এক হোটেলে ঢুকলাম। কিছু খেয়ে চকবাজারের তথা একসময়ের ঢাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে প্রবেশ করলাম। মোঘল আমলে চক মসজিদই ছিল ঢাকার কেন্দ্রীয় মসজিদ। যেখানে নামাজ আদায় করতেন আমীর-ওমারাগণ। এ পাশের রাস্তায় দু'টি প্রবেশ পথ। প্রথমটা বন্ধ থাকায় তার পরেরটা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

মসজিদটির মূল অবকাঠামো মাটি থেকে প্রায় দশ ফুট উঁচুতে, এক বিশাল মসজিদ! মোঘল আমলের বেশ কিছু কারুকাজ বহু সংস্কারের পরও দৃষ্টিআকর্ষণ করছে। এটাও অন্যান্য মসজিদের মত; কয়েকটি খিলান পেরিয়ে ভিতরে বিশাল মসজিদ তবক ও সুদৃশ্য মেহরাব।

একজন খাদেম ঝাড়ু দিচ্ছে তাই মেহরাবের সামনে গেলাম না। পুরো মসজিদ প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। নিচের তলা ঘুরে মনে হলো, এ মসজিদ এর কাঠামো অন্য মসজিদের মতো না। খুবই ভালো লাগল এগুলো।

জুতাজোড়া নিচতলায় রেখে ওপরে গেলাম। দোতলা বন্ধ, তিন তলায় উঠলাম। এরপর ছাদ, খোলা পেয়ে উঠে গেলাম, বড় মিনারটা কাছ থেকে দেখে অবাক হলাম। তাছাড়া আরো কয়েকটি ছোট-বড় মিনার যা থেকে পাঁচ ওয়াক্তে ভেসে যায় মুয়াজ্জিনের আহ্বান। ছাদের পশ্চিম প্রান্তে বড় একটা শাহী গম্বুজ, এর দু'পাশে একটু ছোট দু'টি গম্বুজ। এগুলোর গায়েও মোঘল নিদর্শন স্পষ্ট। বেশ কিছুক্ষণ ছাদে থাকার পর নিচে নেমে এলাম। বের হওয়ার জন্য জুতা নিতে গিয়ে আমি দেখলাম নিচতলায় দরজা লাগানো। বুঝতে পারলাম না, কি করব? এক বৃদ্ধকে গিয়ে বললে উনি সামনের দরজা দিয়ে না ঢুকে পাশের এক দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

-চাচা, এ মসজিদ তো বহু পুরোনো; তো এর প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কোন তথ্য নাই?
-হ আচে তো, দেহ এইটাতে সব লেখা আচে।

প্রবেশপথের পর একটু এগিয়ে দক্ষিণ পার্শ্বে একটা শিলালিপি টাঙানো। ফার্সি

ভাষায় শিলালিপিটিতে লেখা আছে, “সঠিকভাবে পরিচালিত আমীর আল উমরা শায়েস্তা খান, স্রষ্টার জন্য এ মসজিদ নির্মাণ করেছেন। সন্ধানী (তালিব) এর তারিখ অনুসন্ধান করলে- আমি বলেছিলাম, ‘স্রষ্টার আদেশ কার্যকর হয়েছে, ১০৮৬ হিজরি (১৬৭৫ - ৭৬ খ্রিস্টাব্দ) বছর।”

ধারণা করা হয়েছে যে, শায়েস্তা খান নিজেই খোদাই করা শিলালিপিটি রচনা করেছিলেন, কারণ তাঁর কাব্যিক ছদ্মনাম ছিল ‘তালিব’। মোঘল রীতিতে ঈদের চাঁদ দেখা দিলে এ মসজিদের সামনে থেকেই দেওয়া হতো তোপধ্বনি। রমজান মাসে তারাবির নামাজের সময় কিংবা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে মসজিদটি ঝাড়বাতির আলোয় আলোকিত হতো। ইফতারির সময় বিভিন্ন বাড়ি ও দোকানপাট থেকে ইফতারি আসত।

জুতাজোড়া নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি বলল, এখান থেকে হেঁটে গুলিস্তান যাব। হাসান রাজিও হল। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। আর দু’কিলো হাঁটলেই গুলিস্তান, যেখান থেকে বাসায় যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে। গল্প করতে করতে আমরা পথ চলছি। পথমাঝে পুরান ঢাকার শতবর্ষী স্থাপনাগুলো দেখছি। হঠাৎ কি যেন মনে করে হাসান রিকশা ডাক দিল, পরক্ষণে দাম-দর করে চড়ে দু’জনে বসলাম তাতে। চলার সময় আমি রিকশাওয়ালাকে বললাম,

-‘হোসাইনী দালান’টা এখানে না?
-হ, এই তো বামের গলি দিয়ে সামনে আগাইলেই এর দেখা পাবেন।

হাসানকে বললাম, তুই রিকশাটা ডাক না দিলে তো এখান থেকেও ঘুরে যেতে পারতাম। এটা ঐতিহাসিক একটা স্থাপনা। হাসান বুঝতে পারল না, কী এটা? আমি বুঝিয়ে বললাম, এটা শিয়াদের প্রার্থনাগাহ। মোগল শাসনামলে সতের শতকে নির্মিত।
রিকশা এগোতে থাকল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পাসের সামনে দিয়ে। এ রাস্তা খুবই সুন্দর। কিছুক্ষণ পর গুলিস্তানের এক মোড়ে থামল। ভাড়া পরিশোধ করে রাস্তা পার হলাম, সেখান থেকে বাস ধরলাম বাসায় ফেরার।

শিক্ষা সফর

বেলাল বিন জামাল

আজ রোববার। একদিন পরই মাদরাসায় বার্ষিক পরীক্ষা শুরু। পরীক্ষার পর দীর্ঘ সময় বিরতি থাকবে। চান্দিনার হুজুর এসে বললেন, আমরা

এবার শিক্ষাসফরে যেতে চাই। বললাম আমিও চাই। আলোচনা চলতে থাকল। প্রতি বৃহস্পতিবার মাদরাসায় আমাদের যে সাপ্তাহিক মিটিং হয়, এবার তা হলো শিক্ষাসফর নিয়ে। সিদ্ধান্ত হলো এক দিনের সফরে আশপাশের কোথায় যাওয়া যেতে পারে। মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারণ হলো রসমালাইয়ের শহর কুমিল্লা। পরীক্ষা শেষ হবে মঙ্গলবার। বুধবার বাদ ফজরই রওনা করব কুমিল্লার উদ্দেশে।

অতঃপর চলে এলো সে কাঙ্ক্ষিত সময়। পাঁচটি হায়েস গাড়িতে চুয়াত্তরজনের এক কাফেলা। আমরা ছিলাম চার নম্বর গাড়িতে। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লেন। সকালের নাশতা কলা-রুটি সাথে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুপুরের জন্য পোলাও রোস্ট ইত্যাদি। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে গাড়ি ছুটল কুমিল্লাপানে। দুপাশের সবুজ অরণ্যে নয়ন জুড়ানো দৃশ্য। গাড়ির মৌনতায় বাজছে নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর জবান জপছে জিকিরে দরুদ। আমার পক্ষ থেকে ছিল বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা। সারাদিনের মধ্যে পাঁচ হাজার থেকে বেশি যার দুরুদ পাঠ হবে, তার জন্য রয়েছে বিশেষ বই পুরস্কার।

সবার চোখে মুখে আনন্দের ঢেউ খেলছে। দেখতে দেখতে চলে এলাম কুমিল্লা মহানগরীর ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে লালবাগ এলাকা থেকে দুই কিলোমিটার ভেতরে, রাজেশপুর ইকো পার্কে। প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত রাজেশপুরের এ বনাঞ্চলের গহিন অরণ্যে রয়েছে ব্যাপক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। পার্কে ঢুকতেই পর্যটককে অভিবাদন জানাবে বিশাল ডানা মেলা ঈগল পাখি এবং সবুজ শাল ও জারুল গাছ। শোনা যাবে পাখিদের কিচিরমিচির ডাক। নির্জনতার খোঁজে এবং সবুজের মাঝে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে দর্শনার্থীরা এখানে ভিড় করেন। আজ অবশ্য অন্য দর্শনার্থীরা না থাকায় উপভোগ্য ছিল আরও বেশি। ছাত্ররা মন ভরে পুরো এলাকা দখল করে নেয়। এদিকে আমাদের পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী অন্য কোথাও একত্রিত হওয়ার কথা ছিল বিধায়, আমরা চার গাড়ি এখানে চলে আসলেও বড়ো হুজুরসহ মুরুব্বিদের গাড়ি চলে গেল অন্য কোথাও। বেশ কিছুক্ষণ পর তারাও এসে একত্রিত হলেন আমাদের সাথে। রাজেশপুর ইকো পার্ক নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের গহিন অরণ্যের সাথে সংযুক্ত। মাঝে মাঝে হরিণ, বাঘসহ নানা পশুপাখি এই পার্কের ভেতরে চলে আসে। আমাদের

চোখে তেমন কিছু ধরা না পড়লেও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হলাম সবাই।

গাড়ি ছুটল লালমাই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। লালমাই পাহাড়ের মাটির রং লাল হওয়ার কারণেই বোধহয় একে লালমাই পাহাড় বলে ডাকে। এটি কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলায় অবস্থিত একটি বিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণি। প্রায় পঁচিশ লক্ষ বছর আগে না-কি প্লাইস্টোসিন যুগে এই পাহাড় গঠিত হয়েছিল। পাহাড়টির উত্তর অংশ ময়নামতি পাহাড় এবং দক্ষিণ অংশ লালমাই পাহাড় নামে পরিচিত। আমরা এখানে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন ঘড়ির কাঁটা সাড়ে বারোটা ছুঁই ছুঁই। এখানে পাহাড়ের উপর নির্মিত হয়েছে 'লেক ল্যান্ড পার্ক'। প্রবেশে টিকিট লাগবে জনপ্রতি আশি টাকা। আমাদের লক্ষ্য যেহেতু অনেক দূরে, তাই আর পার্কে প্রবেশ হয়নি। নেমে আসলাম নিচের একটি মসজিদে। পাহাড়ের কোলে এই মসজিদেই আয়োজন হলো আমাদের দুপুরের খাবার ও জোহরের নামাজ। নামাজ শেষ করে গাড়ি নিয়ে উঠলাম পাহাড়ের চূড়ায়। উঠেও মনে হয়নি আমরা কোনো পাহাড়ে আছি। সমতল ভূমি, খেতখামার ও দোকানপাট। অথচ একটু পাশে গিয়ে দেখতেই সবার চোখ ছানাবড়া। এত উপরে আছি! গাছগাছালি ও বাঁশঝাড়ে ঘেরা লালমাই পাহাড়। এত বিশাল গভীর হওয়া সত্ত্বেও দেখি দু-একজন ছাত্র নিচে নেমে পড়ল। তাদের দেখাদেখি একে একে সবাই নেমে পড়ল। পেছনে রইলাম আমি আর এক মুরুব্বি। দুজনে সিদ্ধান্ত নিলাম নামব না। পাশে একটি দোলনা বানানো ছিল। মুরুব্বি দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলেন। অনেকটা শিশুসুলভ ভঙ্গিতে। বুড়ো হলে নাকি মানুষের মাঝে শিশু হওয়ার শখ জাগে। মুরুব্বিকে দেখে তা-ই মনে হলো। আমি হেঁটে হেঁটে দেখছিলাম। পাহাড়ের নিচে মাটির তৈরি ছোট ছোট ঘরবাড়ি। ঘরের মাটিগুলোও লাল। সম্ভবত পাহাড়ের মাটি। একপাশে দেখলাম নিচে নামার সুন্দর পথ তৈরি করা আছে। সাথে সাথেই নেমে পড়লাম। অন্যদের সাথে শরিক হলাম। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো নয়নাভিরাম আরও একটি লাল পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ওখানে উঠতে পাড়লে আরও মজা হতো। কিন্তু অত সময় তো এখন আর নেই।

এবার ছুটলাম কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী কোটবাড়ির উদ্দেশ্যে। প্রথমেই শালবন বিহার ঘুরে দেখলাম। কুমিল্লার ময়নামতিতে খননকৃত সব প্রত্নতাত্ত্বিক

নিদর্শনের মধ্যে শালবন বিহার অন্যতম প্রধান। কোটবাড়িতে বার্ডের কাছে লালমাই পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকায় এ বিহারটির অবস্থান। বিহারটির আশপাশে একসময় শাল-গজারির ঘন বন ছিল বলে এ বিহারটির নামকরণ হয়েছিল শালবন বিহার। এর সন্নিহিত গ্রামটির নাম শালবনপুর। এখনও ছোটো একটি বন আছে সেখানে। বাংলাদেশে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম এই শালবন বৌদ্ধবিহার। আগে এই প্রত্নকেন্দ্র 'শালবন রাজার বাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। পরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একে শালবন বিহার নামে আখ্যায়িত করা হয়। শালবন বিহারের ভেতরে ঘুরতে গিয়ে সত্যিই অন্যরকম অনুভূতি সৃষ্টি হলো হৃদয়ে। চারদিকে সবুজ প্রান্তর। তার সঙ্গে রাঙা ইটের তৈরি প্রাচীন প্রাচীরের মিতালি। কসমস, ডালিয়া, জিনিয়াস নানা প্রজাতির ফুলের সমাহার ছড়িয়ে আছে চারদিকে। দু'চোখ যেন জুড়িয়ে গেল ছায়া সুনিবিড় সবুজ অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে রোদের খেলায় মত্ত চমৎকার এই শালবন বিহার দেখে।

কুমিল্লা ভ্রমণ সব মিলিয়ে বেশ আনন্দদায়ক ছিল। লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে ঘোরাঘুরি শেষ করে ফিরে আসার পর কেবলই মনে পড়ছে সেই আনন্দময় মুহূর্তের কথা।

উস্তায: জামিয়া ইসলামিয়া তালীমুল কুরআন খালপাড়, নারায়ণগঞ্জ

ইনানী: প্রকৃতির নিবিড় কবিতা

শেখ একেএম জাকারিয়া

ভ্রমণ কেবল স্থানান্তরের অভিজ্ঞতা নয়, এটি একটি অন্তর্দৃষ্টি-একটি নীরব উপলব্ধি, যেখানে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য ও রহস্যের ভাষায় আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। কক্সবাজারের ইনানী সমুদ্রসৈকত এমনই এক অপরূপ স্থান, যেখানে নীল জলরাশি, সোনালি বালুকাবেলা, প্রবালময় তটরেখা ও সবুজ পাহাড় একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক স্বপ্নময় জগৎ। এটি কেবল একটি সৈকত নয়, বরং প্রকৃতির নিবিড় কবিতা-যা হৃদয়ের গভীরে এক চিরস্থায়ী প্রবাহ সৃষ্টি করে এবং সেই প্রবাহে হারিয়ে গেলে আমরা অনুভব করি, আমাদের অস্তিত্ব যেন প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির অলংকার: ইনানী সৈকত

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সমুদ্রসৈকতগুলোর মাঝে ইনানী এক অনন্য বিস্ময়।

বঙ্গোপসাগরের বিশালতা এবং প্রকৃতির অপরূপ রূপের মিলনস্থলে এটি যেন এক নিখুঁত অলংকার, যেখানে প্রকৃতি তার সমস্ত মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়েছে। কক্সবাজার শহর থেকে মাত্র ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ইনানী, হিমছড়ি থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে, যেন একটি অজানা পৃথিবী।

সৈকতের একপাশে সুনীল সমুদ্রের অবারিত বিস্তার, অন্য পাশে সবুজ পাহাড়ের স্নিগ্ধ ছোঁয়া-এই দৃশ্যগুলো এক অন্যরকম অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি এনে দেয়। ইনানীর সৌন্দর্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর প্রবালময় সৈকত, যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রবাল পাথরের গায়ে যেন সময়ের নিঃশব্দ ভাষা খোদাই করা। সূর্যের আলোয় যখন নীল জলরাশি প্রতিফলিত হয়, তখন সোনালি বালুরাশি আর প্রবালের মায়াজালে বিচরণকারী ঢেউয়ের ছন্দময় বিন্যাস এক অমোঘ মোহ সৃষ্টি করে।

এই দৃশ্য শুধু চোখের জন্য নয়, মন ও আত্মার জন্যও এক অনন্য পিয়ানো সুরের মতো। যেন প্রকৃতি তার গোপন সুরে আমাদের জীবনের অব্যক্ত কথাগুলো বলে যাচ্ছে। এমন সৌন্দর্য, যা একবার অনুভব করলে তা হৃদয়ে চিরস্থায়ী প্রতিধ্বনি তোলে, যা সহজে মুছে যায় না।

রোমাঞ্চ ও নির্জনতার অপূর্ব সমন্বয়

ইনানী সৈকত শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নয়, বরং রোমাঞ্চ ও নির্জনতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন। উত্তাল ঢেউয়ের বুকে সার্ফিং অথবা স্নরকেলিংয়ের মাধ্যমে অ্যাডভেঞ্চারের শিহরন অনুভব করা যায়, আবার যারা নির্জনতা ভালোবাসেন, তারা এখানে এসে সমুদ্রের ধারে বসে সূর্যাস্তের রং বদলের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন, যেখানে আকাশ ও সমুদ্র এক হয়ে যায় এক অলৌকিক অনুভূতির সীমানায়। এই সময়টাতে যেন প্রকৃতি নিজেই কথা বলে, প্রতিটি ঢেউ হয়ে ওঠে একেকটি কাব্য, আর বাতাসের স্পর্শে অনুভব হয় তার অমলিন স্নিগ্ধতা।

সৈকতের ধারে নিঃশব্দে হাঁটলে মনে হয়, সময় থমকে গেছে। প্রকৃতি তার গোপন ভাষায় আমাদের কাছে এক অমর কবিতা পাঠ করছে। সমুদ্রের গর্জন, বাতাসের মৃদু স্পর্শ আর ঢেউয়ের অনন্ত সুর-এই মিলিত আবহে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে সমস্ত কোলাহল, সমস্ত অস্থিরতা। প্রকৃতি তার নিজস্ব সুরে আমাদের মনের গভীরে শান্তির বীজ রোপণ করে।

পর্যটন সুবিধা ও যাতায়াত ব্যবস্থা

ইনানী সৈকতের জনপ্রিয়তা দিনদিন বাড়ছে, আর সেইসঙ্গে এখানে গড়ে উঠছে আধুনিক পর্যটন সুবিধা। সৈকতের পাশের সাগরের গর্জন, শান্ত বাতাস, আর আধুনিক হোটেল, রিসোর্ট এবং রেস্তোরাঁগুলো এক অদ্ভুত সমন্বয়ে এক নিখুঁত পরিবেশ তৈরি করেছে। সমুদ্রের গর্জনের মাঝে রাতযাপন এখানে এনে দেয় এক অনন্য অনুভূতি, যেন প্রকৃতি তার সমস্ত রহস্য উন্মোচন করতে প্রস্তুত।

কক্সবাজার শহর থেকে ইনানীতে যাওয়ার জন্য সিএনজি, অটোরিকশা ও মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। মাইক্রোবাসে দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হলেও, সিএনজি বা অটোরিকশায় যেতে যেতে প্রকৃতির আরও কাছাকাছি আসার সুযোগ মেলে। এখানে প্রবেশের জন্য কোনো ফি নেই, যা এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

অমলিন এক স্বপ্নস্মৃতি

ইনানী সৈকতের সৌন্দর্য কেবল চাক্ষুষ দেখার বিষয় নয়, এটি এক অনুভূতি, যা অবর্ণনীয়। প্রবালের শীতল স্পর্শ, জলরাশির অবারিত বিস্তার, পাহাড়ের সবুজ মায়া-সবকিছু মিলে সৃষ্টি করেছে এক অতুলনীয় আবহ, যা হৃদয়ের গভীরে এক চিরস্থায়ী সুর তোলে।

এটি শুধু একটি সৈকত নয়; এটি এক অনুভূতি-প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে আত্মবিস্মৃত হওয়ার এক আশ্চর্য উপলক্ষ্য। একবার এখানে এলে মনে হয়, প্রকৃতি নিজ হাতে এক সোনালি স্বপ্ন এঁকে রেখেছে, যেখানে মানুষ বারবার ফিরে যেতে চায়, হারিয়ে যেতে চায় অনন্ত সৌন্দর্যের মায়ায়।

কবি ও ছড়াকার

সভাপতি, সুনামগঞ্জ সাহিত্য সংসদ (সুসাস)

স্বপ্ন ছোঁয়ার এক অধ্যায়

বিনতে আব্দুল হামিদ

সফর কেবল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন নয়; এটি এক অভিজ্ঞতা, যা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন মানুষের সঙ্গে মিশে আমরা নিজেদের আরও ভালোভাবে জানতে পারি। সফর একটি জানালা, যা খুলে দেয় নতুন দিগন্ত। প্রতিটি পদক্ষেপে লুকিয়ে থাকে অচেনা পথের হাতছানি, যা আমাদের মন ও হৃদয়কে সমৃদ্ধ করে। তবে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য ভ্রমণ নিঃসন্দেহে এক দুর্লভ স্বপ্ন। আর্থিক সীমাবদ্ধতা, সময়ের অভাব এবং পারিবারিক দায়িত্বের কারণে প্রায়ই তাদের ইচ্ছা পূরণ হয় না।

সিলেটের এক অজপাড়া গাঁয়ের একটি স্কুলে দুই ভাই-বোন একসঙ্গে পড়ত। শুধু সহপাঠী নয়, তারা একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। দুজনেই ছিল প্রকৃতিপ্রেমী; নতুন জায়গা দেখার প্রবল ইচ্ছে তাদের হৃদয়ে দোলা দিত। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়ায় সেই ইচ্ছা বারবার বাধাগ্রস্ত হতো। প্রায়ই শোনা যেত, অন্যান্য ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাসফরে যায়, কিন্তু তাদের ব্যাচের ভাগ্যে এমন সুযোগ কখনো আসেনি।

সময়টা ছিল ২০২০ সালের শীতকাল। সামনে ছিল এসএসসি পরীক্ষা, যা তাদের শিক্ষাজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাদের চোখে ছিল শিক্ষাসফরের স্বপ্ন, কিন্তু প্রধান শিক্ষকের অনীহায় সেই স্বপ্ন ফিকে হয়ে আসছিল।

অবশেষে, ছাত্ররা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে শিক্ষাসফরের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা কয়েকজন সহকারী শিক্ষকের কাছে গিয়ে অনুরোধ করল, যাতে তাঁরা সফরে তাদের সঙ্গে যান। গণিত, ইংরেজি ও কেরানি স্যার রাজি হন এবং সিদ্ধান্ত হয়—বাংলাদেশের চায়ের রাজধানী শ্রীমঙ্গল হবে তাদের গন্তব্য।

সফরের পুরো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল আমার ভাই ও তার বন্ধুদের ওপর। ৩০জন ছাত্র ও ৩জন শিক্ষককে নিয়ে একটি বাস ভাড়া করা হয়। সকালের নাশতার জন্য ব্রেড ও কলা এবং দুপুরের খাবারের জন্য বিরিয়ানির ব্যবস্থা

করা হয়। খরচ মেটানোর জন্য সবার কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়। কিন্তু সমস্যা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছিল না। হঠাৎ গণিত স্যার জানালেন, তিনি যেতে পারবেন না। তবুও ছাত্ররা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এরপর সফরের একদিন আগে ইংরেজি স্যারও পারিবারিক সমস্যার কারণে যেতে পারবেন না বলে জানান। কিন্তু এতদূর এসে সফর বাতিল করার প্রশ্নই ওঠে না। সেদিন রাতে আমার ভাই কেরানি স্যারের সঙ্গে পরামর্শ করে পরদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন। ভোরে উঠতে হবে, তাই সব প্রস্তুতি সেরে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লেন। ফজরের আগেই ভাইয়া উঠে প্রস্তুত হয়ে নামাজ আদায় করেন। চারপাশ ছিল ঘন কুয়াশায় ঢাকা, আর দূর থেকে ভেসে আসছিল পাখির মিষ্টি সুর। সঙ্গে ছিলেন তার এক বন্ধু। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে সুরমা নদী পার হয়ে গাড়িতে করে বাস স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বাস স্ট্যান্ড থেকে আগেই ভাড়া করা বাস নিয়ে স্কুলের পথে ফিরতেই প্রথম বিপত্তি ঘটে। গ্রামের সরু রাস্তা দিয়ে ঢোকার সময় বাসের একটি চাকা নষ্ট হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রদের মধ্যে শঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে-সফর কি তবে শুরু হওয়ার আগেই থেমে যাবে? সৌভাগ্যবশত, বাসের চালক ছিলেন অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ। তিনি কোনো বিরক্তি প্রকাশ না করে বরং দ্রুত অন্য একটি বাসের ব্যবস্থা করে দেন, আর ভাইয়া কল দিয়ে সবাইকে নতুন বাসের কাছে আসতে বলেন। সবাই দ্রুত সেখানে জড়ো হলো, নতুন বাসে উঠল। এরপর স্থানীয় বাজারে বাসটি থামে, সেখান থেকে আগেই অর্ডার করা খাবার সংগ্রহ করা হয়। খাবার হাতে পেয়েই আবার পথচলা শুরু হয়।

কুয়াশাচ্ছন্ন পথ, হালকা শীতল বাতাস আর চারপাশে উচ্ছ্বসিত বন্ধুরা-সব মিলিয়ে পরিবেশ হয়ে উঠেছিল আনন্দময়। সবাই বাসের মধ্যে দারুণ মজা করছিল, কেউ গল্প করছিল, কেউ গান গাইছিল। সেই প্রাণোচ্ছল মুহূর্তেই সকালের নাশতা সেরে নেয় তারা। সবার মনে ছিল এক অদ্ভুত উচ্ছ্বাস-সফরের আসল আনন্দ যেন সেখান থেকেই শুরু হলো।

সকাল ৭:৪৫ মিনিটে তারা মৌলভীবাজার পৌঁছায় এবং প্রথমেই বাইক্কা বিলের উদ্দেশে রওনা দেয়। শীতকাল হওয়ায় পুরো বিলজুড়ে অসংখ্য অতিথি পাখির সমারোহ ছিল, আর তাদের কলকাকলিতে সৃষ্টি হয়েছিল এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। সবাই মিলে পাখি দেখার এক অনন্য অভিজ্ঞতা উপভোগ করে। পরবর্তী গন্তব্য ছিল লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতেই মনে হলো—এক রহস্যময় জগতে প্রবেশ করেছে তারা। দুই পাশে

সুউচ্চ গাছ, আর নির্জন পথে হাঁটার এক অন্যরকম অনুভূতি! উদ্যানের মধ্য দিয়ে একটি রেললাইন ছিল। হঠাৎ দূর থেকে ট্রেনের শব্দ ভেসে এলো, উদ্যানের মধ্যে দিয়ে যখন ট্রেন ছুটে গেল, তখন সবার আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

এরপর তারা নুরজাহান টি স্টেটে যায়। সেখানে কিছু চা-শ্রমিকদের সাথে কথা বলার এবং চা-শ্রমিকদের জনপ্রিয় খাবার চা-পাতার ভর্তার স্বাদ নেওয়ার সুযোগ হয়। সবুজ চা-বাগানে আরও অনেক ভ্রমণপ্রেমী মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, যা ভ্রমণের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেয়। চা-বাগানের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে ছবি তুলে স্মৃতিগুলো ধরে রাখল। দুপুরে তারা সুস্বাদু বিরিয়ানি খেয়ে বিখ্যাত সাত রঙের চায়ের স্বাদ নিতে যায় আদি নীলকণ্ঠ চা কেবিনে। সাত স্তরের চায়ের অনন্য স্বাদ শিক্ষার্থীরা আজও ভুলতে পারেনি।

তারপর গন্তব্য ছিল শিথেস বাবুর চিড়িয়াখানা। টিকিট কেটে ভেতরে প্রবেশ করতেই শিক্ষার্থীদের চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। এতদিন যে প্রাণীদের শুধু বইয়ে পড়েছিল, এবার সেগুলোকে স্বচক্ষে দেখে তারা অভিভূত হয়ে যায়। সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটে বাঁদরের খাঁচার সামনে। এক শিক্ষার্থী ছবি তুলতে গেলে বাঁদরটা হঠাৎ মোবাইলের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আচমকা আঘাতে মোবাইলটি তার হাত থেকে নিচে পড়ে যায়। সবাই প্রথমে অবাক হয়ে গেলেও পরে হাসিতে ফেটে পড়ে। এই ছোট্ট ঘটনাই সফরের আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সন্ধ্যায় ক্লান্ত শরীর আর প্রশান্ত মনে তারা বাড়ির পথে রওনা দেয়। সবার মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি।

এই সফর শুধু একটি ভ্রমণ ছিল না; বরং এটি ছিল সংগ্রাম করে স্বপ্ন ছোঁয়ার এক সফল গল্প। সীমাবদ্ধতা থাকলেও ইচ্ছাশক্তি থাকলে সব বাধাই জয় করা সম্ভব—এই শিক্ষাসফর সেই প্রেরণার গল্প হয়ে থাকবে।

সিলেট সদর, সিলেট

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সফর: কিছু শিক্ষা, কিছু অনুভূতি

মুহা. শাহাদাত হুসাইন

যাত্রা শুরু:

প্রথমবারের মতো রেল সফর। গন্তব্য- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহর। উদ্দেশ্য- আব্দুর রহমানের ওলিমাহ। সফরসঙ্গী আটজন-মাওলানা শামছুদ্দিন সাহেব, আমি এবং আব্দুর রহমানের সহকর্মীরা। আব্দুর রহমানের সাফ কথা- তাদের বাসায় যেতেই হবে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কোনোভাবে এড়িয়ে যেতে, কিন্তু ব্যর্থ হলাম। সে আগেভাগেই যাওয়া-আসার টিকিট কেটে রেখেছে। ৫তারিখ বুধবার সাতসকালে রওনা হলাম রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে। হাতে একটি কিতাব-'উলূমুল হাদিস কী? কেন? ও কীভাবে?'। এরই মধ্যে আব্দুর রহমানের ফোন। খোঁজ নিচ্ছে, বের হয়েছি কি না। 'লাইলাতুল উসরাহ' (বিবাহের প্রথম রাত) না পোহাতেই নতুন মেহমানকে রেখে আমরা যাত্রা শুরু করলাম কি না, সে নিশ্চিত হতে চায়। তার এমন আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা করার নয়। অন্যথায়, আমি সাধারণত কোথাও যেতে কিংবা ভ্রমণে বের হতে অভ্যস্ত নই।

মুফতি শামছুদ্দিন সাহেব ও আব্দুর রহমানের সহকর্মীরা ট্রেনে উঠেছেন কমলাপুর স্টেশন থেকে, আর আমি এয়ারপোর্ট স্টেশন থেকে। জানালার পাশে বসেছি। ট্রেন ছুটছে দুরন্ত গতিতে, আর আমি প্রকৃতির মোহময়

শোভায় মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। কত নিপুণ হাতে গড়া এই প্রকৃতি! প্রতিটি দৃশ্যপট যেন কোনো চিত্রশিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা এক অপূর্ব ক্যানভাস। লোহার ছাঁচের ওপর দিয়ে প্রকৃতির বুক চিরে লক্কর-ঝক্কর শব্দ তুলে ছুটে চলেছে ট্রেন। বাতাসের শীতল স্পর্শে মন উদাস হয়ে যাচ্ছে। স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে অসংখ্য স্মৃতি। প্রকৃতিকে অনেক আপন মনে হচ্ছে।

রেললাইনের দুপাশে সারি সারি গাছ, ইট-পাথরের দালান, ছোট ছোট ছাউনি দেওয়া কুটির-সবকিছু যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দূর দিগন্তে আকাশ যেখানে মাটিকে ছুঁয়েছে, মন যেন বারবার সেখানে ছুটে যেতে চায়। এভাবেই ট্রেন এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে।

আমার ভাবনাও এগিয়ে চলেছে অন্য এক সফরের দিকে। এই ছোট্ট জীবন গাড়িটিও যেন আমার মতোই। কবরের গন্তব্য ও পরকালের ঠিকানার দিকে ছুটে চলছে। স্বাভাবিক গতিতে। চলতে চলতে একদিন সে থেমে যাবে। কোন এক অজানা সময়ে পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। রবের সান্নিধ্যে। জীবন সফর শেষ হবে। অনন্তের সফর শুরু হবে...

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনে:

এয়ারপোর্ট স্টেশন থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বিস্ময় জাগল মনে! এত অল্প সময়ে এত দূরের পথ পেরিয়ে আসা- ব্যস্ত সড়কের বাস যাত্রায় যা প্রায় অসম্ভব। কুমিল্লা যেতে যেখানে প্রায় একদিন বরাদ্দ রাখতে হয়, সেখানে রেলে যেন সময়ে বরকতে স্রোতধারা। বাসের সফরের ন্যায় না আছে যানজট, না আছে ক্লান্তির বোঝা।

স্টেশনে পৌঁছাতেই দেখি, আব্দুর রহমান দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। সফরের শুরুতেই তার আন্তরিকতার উষ্ণ ছোঁয়া পেলাম। একে একে সবার সঙ্গে মুসাফাহা করল সে। আমাদের পেয়ে ওর চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক। আনন্দ যেন তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে।

আতিথেয়তার উষ্ণ পরশ:

স্টেশন থেকে পথ পেরিয়ে আব্দুর রহমানের বাসায় পৌঁছালাম। শুরুতেই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য রং-বেরঙের নকশী পিঠা বিশাল এক ডিসে সাজিয়ে আনা হলো। সাথে মধুও রাখা, যেন যার যার ইচ্ছেমতো স্বাদ নিতে পারে। অতিথিপরায়ণতার এই অপূর্ব নিদর্শন দেখে হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে গেল।

পিঠার স্বাদ উপভোগ করছি, এমন সময় আব্দুর রহমানের বাবা উপস্থিত হলেন। তিনি হঠাৎ উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন, আমাদের সাথে মুসাফাহা করতে করতে যেন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমি হতবাক হয়ে গেলাম-কোনো দুর্ঘটনা

ঘটেছে নাকি?!! কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম, এই কান্না দুঃখের নয়; আবেগের।

কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আপনারা এত কষ্ট করে ঢাকা থেকে এসেছেন আমার সামান্য ঘরে! আপনাদের যথাযথ সম্মান করতে পারার মতো সামর্থ্য আমার নেই।" মাওলানা শামছুদ্দিন কাসেমী সাহেব স্নিগ্ধ হাসিতে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আপনাদের আন্তরিকতাই আমাদের এখানে এনেছে। আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।"

পিঠার পর এলো সুস্বাদু কলিজা-খিচুড়ি। আমরা খাবারের স্বাদ নিতে নিতে মাগরিব পর্যন্ত পুরো সফরসূচি চূড়ান্ত করলাম।

জামিয়া ইউনুসিয়া যেয়ারত:

এরই মধ্যে সুসংবাদ এলো, জামিয়া ইউনুসিয়ার মুহতামিম মুফতি মুবারকুল্লাহ সাহেব মাদরাসার অফিসে এসেছেন। তাঁর যেয়ারতের জন্য রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছাতেই তিনি দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে খোলা মনে মুসাফাহা করলেন। আমাদের সামনে দেওয়া হলো, তুলতুলে পাউরুটি আর গরম রং চা।

চায়ের কাপে চুমুক দিতেই স্মৃতিচারণের আসর জমে উঠল। শামছুদ্দিন সাহেব মুফতি আমিনী (রহ.)-এর স্মৃতি তুলে ধরলেন। মুহতামিম সাহেবও ইতিহাসের পাতাগুলো খুলতে লাগলেন, সংযোজন করলেন অনেক মূল্যবান ঘটনা। কথায় কথায় জামিয়া ইউনুসিয়ার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হলো।

শামছুদ্দিন সাহেব জানতে চাইলেন, "এখনো কি জায়গীর সিস্টেম আছে?" মুহতামিম সাহেব বললেন, "জ্বী, এখনও আছে। প্রায় আড়াইশো-তিনশো ছাত্র মাদরাসার বোর্ডিংয়ে খাবার খায়, বাকিরা সবাই জায়গীরে। শুধু দাওরায়ে হাদিসেই চার শতাধিক ছাত্র রয়েছে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন এই বোর্ডিং চালু হয়। তার আগে এই মাদরাসায় কোন বোর্ডিং ছিল না।"

আলোচনা শেষে মুহতামিম সাহেবের কাছে কিছু নসিহত কামনা করা হলো। তিনি সংক্ষেপে কিন্তু গভীর অর্থবহ দুটি কথা বললেন-

"দু'টি কথা:

(ক) আলী মিয়া নদভী (রহ.) বলেছেন, ইলম ও আমলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দুটি গুণ থাকা আবশ্যক-

১. ইখলাস (আন্তরিকতা)

২. ইখতিসাস (বিশেষজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্য)

ইখলাস অর্থাৎ সবকিছু কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। আমল ও ইলম তখনই বরকতময় হয়, যখন তার ভিত্তি ইখলাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

ইখতিসাস অর্থাৎ কোনো বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করা, বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা। বিশেষজ্ঞতা অর্জন না করলে

কেউ মাওলানা-মুফতি হয়েও বিশ্বজোড়া পরিচিতি লাভ করতে পারে না। অথচ ইখতিসাসের কারণেই একজন শুধু হাফেজ হয়েও, আরেকজন শুধু কারী হয়েও দেশ ও দেশের বাইরে দাপিয়ে বেড়ায়। যদিও জানেই না সে কী পড়ছে?!! যা পড়ছে তার অর্থ কী?!!

(খ) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-যে এলাকায় থাকব, সেখানে মানুষের আস্থাভাজন হতে হবে। ইলম, আমল ও উত্তম আখলাকের মাধ্যমে এমন মর্যাদা অর্জন করতে হবে, যাতে লোকজন আমাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। যদি মানুষ আমাদের প্রতি আস্থা রাখে, তবে কখনো রাগের সুরে কিছু বললেও তারা সেটাকে ইতিবাচকভাবে নেবে। তারা আমাদের বিরোধিতা করবে না, বরং আমাদের কথাকে গুরুত্ব দেবে, আমাদের পাশে থাকবে।"

হজরতের নসিহত হৃদয়ে রেখাপাত করল। মনে হলো, সফর শুধু দেখার নয়, শেখারও এক অনন্য সুযোগ। আল্লাহ যেন এই নসিহতগুলো বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর তাওফিক দান করেন। আমিন।

যেয়ারত শেষে মাদরাসা থেকে বের হওয়ার মুহূর্তেই মসজিদের গেটে সাক্ষাৎ হলো মাওলানা সাজিদুর রহমান সাহেবের সঙ্গে। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং নাশতার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তবে আমরা ইতোমধ্যেই নাশতা সেরে নিয়েছি, তাই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এবার গন্তব্য: জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলুম ভাদুঘর:

বেলা এগারোটা। সবাই মিলে একটা বড় অটোতে উঠে বসলাম। এবার গন্তব্য সিরাজুল ইসলাম বড় হুজুরের প্রতিষ্ঠিত 'জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলুম ভাদুঘর'। আমাদের আগমন সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিলেন বড় হুজুরের নাতি, মাওলানা হাবিবুল্লাহ সিরাজী সাহেব। যিনি বর্তমানে মাদরাসার নায়েবে মুহতামিম।

মাদরাসায় পৌঁছানোর পর হৃদ্যতাপূর্ণ আপ্যায়ন ও স্মৃতিচারণ চলল বেশ কিছুক্ষণ। কথার একপর্যায়ে সিরাজুল ইসলাম বড় হুজুরের মাকবারার প্রসঙ্গ উঠল। তিনি জানালেন, মেইন রোডের পাশেই এটি অবস্থিত, আমরা আসার পথে তা অতিক্রম করে এসেছি। তবে পরীক্ষার হলে তদারকির দায়িত্বে থাকার কারণে তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না। পরিবর্তে, এক ছাত্রকে

দায়িত্ব দিলেন আমাদের পথ দেখানোর জন্য।

শ্রদ্ধাভরে বড় হুজুরের মাকবারায় ফাতিহা পাঠ করলাম। দীর্ঘ সফরের মাঝে এই মুহূর্তটি হৃদয়ে এক গভীর প্রশান্তি এনে দিল। মনের আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, 'হে প্রভু! মাহান পুরুষরা চলে গেলেন। আমরা তাঁদের অযোগ্য উত্তরসূরি। উম্মাহ ও দাওয়াহ'র মহান দায়িত্ব আমাদের কাঁধে। অযোগ্য অথর্ব হতে পারি; কিন্তু তোমার দয়া তো অসীম! অযোগ্য হওয়া স্বত্বেও এই মহান দায়িত্ব দিলে। সুতরাং অনুগ্রহ করে যোগ্যতা আর সফলতাও দিয়ে দাও।'

গন্তব্য: দারুল আরকাম আল-ইসলামিয়া:

এরপর আবারও অটোতে চড়ে বসলাম। এবার গন্তব্য মাওলানা সাজিদুর রহমান সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 'দারুল আরকাম আল-ইসলামিয়া' মাদরাসা। আমি বসলাম চালকের পাশে, আর পেছনের সিটে বসে মাওলানা শামছুদ্দিন সাহেব বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলেন। সামনে বসায় কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম না। তবে একবার মৃদু স্বরে শুনলাম-

"রাজনীতি করতে হলে 'গুলিস্তাঁ' ও 'বুখারী সানী' ভালোভাবে পড়তে হবে ও গভীরভাবে আত্মস্থ করতে হবে।"

অবশেষে মাদরাসার সামনে এসে অটো থামল। বাইপাস বিশ্বরোডের সাথেই মাদরাসাটি অবস্থিত। পশ্চিমে নয়নাভিরাম মসজিদ, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছাত্রাবাস, মাঝখানে এক বিশাল মাঠ, আর পূর্বে মহাসড়কের ব্যস্ততা। এমন পরিকল্পিত স্থাপত্যশৈলী ও পরিবেশ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না।

পুনরায় জামিয়া ইউনুসিয়ায়:

অটোতে করে আবার ফিরে এলাম জামিয়া ইউনুসিয়ার মসজিদে। জোহরের সালাত আদায় করে মসজিদের গেটে এসে দেখি আব্দুর রহমানের বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের নিতে। তাঁর আশা, আমাদের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিক মেহমানদারি শুরু করবেন।

আমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা খাবার পরিবেশন করা হলো। একে তো সফরের ক্লান্তি, তার ওপর আন্তরিক আপ্যায়ন-সব মিলিয়ে যেন এক প্রশান্তির আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। খাবার শেষে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি কামরায় বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হলো। কিছু সময় দেশ ও দশের গল্প। গল্পের একপর্যায়ে বর্তমান তাবলিগ জামাত নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। মাও. শামছুদ্দিন সাহেব বললেন,

"পহাড়পুরী হুজুর রহ. (তিনি শামছুদ্দিন সাহেবের শ্বশুর) তাবলিগের মুরুব্বিদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, তাবলিগের

মেহনতের সাথে সাথে যেন সাধারণ সাথিদের 'ফরয আইন ইলম' হাসিল হয়ে যায় এবং আলেমদের সাথে তাদের দূরত্ব দূর হয়ে একাত্মতা তৈরি হয়ে যায়। এ লক্ষ্যে তিনি একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এক্ষেত্রে দাওয়াতের মেহনতে বের হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের এক-তৃতীয়াংশ যেন ওই এলাকার মাদরাসাগুলোতে কাটানো হয়, যাতে ইলম ও আমলের সমন্বয় ঘটে।' কিন্তু দুঃখজনকভাবে, সেই সময় মুরুব্বিরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ফলে সাধারণ মানুষ তাবলীগকেই একমাত্র দ্বীন মনে করতে লাগল; আর আলেমদের থেকে ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে লাগল। ফলশ্রুতিতে বর্তমানের এই পরিস্থিতি।"

এই কথাটি আমার হৃদয়ে খুব রেখাপাত করল। আকাবিরদের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও গভীর চিন্তাভাবনা আমাদের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় ছিল। তখনই মনে পড়ল এক কিতাবে পড়েছিলাম,

"তাবলীগ আসলে একটি মাধ্যম, মূল উদ্দেশ্য নয়। এর প্রকৃত লক্ষ্য হল, মানুষের মধ্যে দ্বীনের তলব সৃষ্টি করা। তলব সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত ছিল, 'ফরযে আইন ইলম' অর্জন। অথচ তাবলিগের বর্তমান নেযামে এর কোনো সুব্যবস্থা নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে সুন্দর সমাধান ওটাই হতো যা পাহাড়পুরী রহ. দিয়েছিলেন। এই পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ও আলেমদের মাঝেও একটা উত্তম সেতুবন্ধন তৈরি হতো। কিন্তু তা হলো না। ফলে তলব পয়দা হওয়ার পর মূল কাজটাই আর হচ্ছে না। ঠিক যেন জমি চাষ করা হচ্ছে, কিন্তু ফসল ফলানো হচ্ছে না। পানি সেচ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মাছ ধরা হচ্ছে না।"

এরপর সবাই আসর পর্যন্ত রেস্ট নিল। আমি আমার সহপাঠী মাওলানা যোবায়ের ভাই এর ফোন পেয়ে নিচে নেমে এলাম। সেখানে আব্দুর রহমানও উপস্থিত। কিছুক্ষণ প্রাণবন্ত আড্ডা জমল। যোবায়ের ভাই একজন ব্যবসায়ী; কাছেই তাঁর একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে। তিনি আমাকে দোকানে নিয়ে গেলেন এবং পাশের দোকান থেকে মজাদার ও পুষ্টিকর কাশ্মীরি জুস খাওয়ালেন। বলা যায়, বাধ্য করলেন! আবার আমাকে পৌঁছে দিলেন।

আসরের সালাত জামিয়া ইউনুসিয়ার মসজিদে আদায় করলাম। সালাত শেষে আমরা গেলাম আল্লামা ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর কবর যেয়ারতে। মাকবারাটি মাদরাসার আনুমানিক ৫০ গজ দক্ষিণে অবস্থিত। ফাতেহা খানি শেষে এখানেও সেই পূর্বের অনুভূতি; মনের সেই নীরব আকুতি। সাথে স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে মাও. নাসীম আরাফাত সাহেবের

আকবীর সিরিজ 'বাংলার হীরে মতি পান্না'র আল্লামা ফখরে বাঙ্গাল রহ. বইয়ের পাতাগুলো।

বিদায় মুহূর্ত:

আবারও ফিরে এলাম পূর্বের কামরায়। এ সময় আব্দুর রহমান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। কারণ, তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে।

কিছুক্ষণ পরই তার বাবা ও বড় ভাই উপস্থিত হলেন, সাথে আনলেন নাশতা। আব্দুর রহমানের বাবার পুনরায় আবেগতাড়িত আকুতি। আন্তরিকতার এই ছোঁয়া সফরকে যেন আরও স্মরণীয় করে তুলল।

মাগরিবের নামাজ শেষে বিদায় নেওয়ার পালা। আমরা রওনা দিলাম রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে। আব্দুর রহমান আমাদের আসা-যাওয়ার টিকেট ১০ দিন আগেই নিশ্চিত করে রেখেছিল।

স্টেশনে পৌঁছাতেই দেখলাম, ৪-৫ জন অন্ধ ভিক্ষুক একে অপরের কাঁধে হাত রেখে চলছে আর ছন্দে ছন্দে সঙ্গিত গেয়ে সুরের ঝঙ্কারে পরিবেশটাকে মুখরিত করে তুলছে। আব্দুর রহমানের এক সহকর্মী বললেন, "আল-আ'মা (الأعمى) শিল্পিগোষ্ঠী যাচ্ছে।" এ কথা শুনে আমার হাসি আটকানো বড় দায়।

কিছুক্ষণ পর ট্রেন এলো। ঘড়ির কাটায় ঠিক সাতটা বাজে, ট্রেন ছেড়ে দিল।

উল্লেখ্য, পুরো সফরজুড়ে আব্দুর রহমানের সহকর্মীদের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি সফরের শুরুতে তাঁদের জন্য নতুন হলেও, সফর শেষে মনে হলো-বহু পুরোনো বন্ধুদের সাথেই যেন এই সময় কাটিয়েছি। এজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

রাত নয়টা নাগাদ নিজ মাদরাসায় পৌঁছে গেলাম। এভাবেই আমাদের এক ব্যতিক্রমী সফর সমাপ্ত হলো। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা হলো অগণিত শিক্ষা, স্মৃতি ও অনুভূতি-যা হয়তো আজীবন মনে থাকবে!

নিঝুম দ্বীপ: যেখানে প্রকৃতি কথা বলে

আফছানা খানম অথৈ

আমি, নীলা, শিলা ও রিয়া। এই কয়েকজন বন্ধু মিলে ভ্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের হাতিয়া জেলার বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র, নিঝুপ দ্বীপ। এই দ্বীপে বাংলাদেশের যেকোন প্রান্ত থেকে মানুষ আসে। আমরাও যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। যেই কথা সেই কাজ। চার বান্ধবী খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। শীত লাগছে, তবুও উঠে পড়লাম। একটা টেক্সি ভাড়া করলাম। চারজন টেক্সিতে আরাম করে বসলাম। গাড়ি গড়গড় শব্দ করে এগিয়ে চলল।

সূর্যীমামা তার আলো ছড়াতে শুরু করল। শীতের সকালের মিষ্টি রোদ খুব। গাড়ি তার গতিতে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা খোশগল্পে মেতে উঠলাম। নীলা, শিলা ও রিয়া এর আগে কখনো গ্রামে আসেনি। এই প্রথম তাদের গ্রামে আসা। তবুও গ্রামের মেঠোপথ, আঁকাবাঁকা রাস্তা ও সবুজে ঘেরা ঘরবাড়ি তাদের ভালো লেগেছে। তারা গাড়ির ভিতরে থেকে বাহিরে তাকিয়ে এসব দৃশ্য দেখছে আর ছবি তুলছে। ভিডিও করছে। বেশ ভালোই লাগছে। কোন ফাঁকে গাড়ি তার

গন্তব্যস্থলে এসে ব্রেক করলো, টেরই পেলাম না।

গাড়ি থেকে সবাই নেমে পড়লাম। ঘড়িরকাটা দুপুর বারোটা। ক্ষুধায় পেট ছোঁ ছোঁ করছে। হালকা টিপিনের দরকার। কিন্তু এখানে তেমন ভালো মানের দোকানপাট নেই। কিছু টং দোকান আছে। শুধু চা বিস্কুটের ব্যবস্থা আছে। আল্লাহর রিযিক। সবসময় আলহামদুলিল্লাহ। নাস্তার পর্ব শেষ করলাম। এবার নদী পথে রওয়ানা করার প্রস্তুতি । সমস্যা বাধলো যখন জানলাম, ঘাটে একটা নৌকাও নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

কি আর করার, কিছু সময় এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করলাম। প্রখর রোদ। খুব ক্লান্ত লাগছে। সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়লাম। কিছু ছবি তুললাম। ভিডিও করলাম। একটা নৌকা আসছে শুনে সবাই দ্রুত উঠে বসলাম। এবার আর মিছ করা যাবে না। মাঝি ঠকঠক শব্দ করে এগিয়ে চলল। কিছুদূর যাবার পর দেখলাম একঝাঁক বালি হাঁস সমুদ্রে খেলা করছে।
বান্ধবিরা চিৎকার করে বলে উঠল;
– ওগুলো কী বন্ধু?
– বালি হাঁস।
– বাহ খুব সুন্দর তো।
বালি হাঁস দেখে তারা আশ্চর্য হলো। হাঁসগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে সাথে একবার উপরে উঠে আবার নিচে নামে। যেন তারা সাঁতার কাটছে। খুব ভালো লাগছে। সবাই আগ্রহ ভরে দেখলাম।

নৌকা কুলে ভিড়ল। নেমে টেক্সিতে উঠলাম। চলে গেলাম হোস্টেলে। একটা ডাবল সিটের রুম ভাড়া নিলাম। কেয়ার টেকার এসে আমাদের সব বুঝিয়ে দিয়ে গেল। ফ্রেস হয়ে নিলাম। এরই মধ্যে আমাদের দুপুরের খাবার এসে গেল। খাওয়া শেষে সবাই মিলে বিশ্রাম নিলাম।

বিকাল বেলা বের হলাম। নিঝুপ দ্বীপ বড় এরিয়া। এখানে দুটো চর। একটার নাম চর ওসমান, অপরটার নাম কমলার চর। নিঝুম দ্বীপের মুল সদরে হোস্টেল, রেস্টুরেন্ট, বাজার, আশ্রয় কেন্দ্র, স্কুল, মাদরাসা ও মক্তব অনেক কিছুই আছে। এখানে মানুষ বসবাস করছে অনেক আগে থেকে। কিন্তু কমলার চর এখনো আবাদ হয়নি। কোনো মানুষ নেই। শুধু গাছভরা বাগান। আমরা বের হলাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য।
একপাশে বাগান আরেকপাশে মানুষ। আমরা হাঁটতে হাঁটতে একেবারে বাগানের ভিতর ঢুকে পড়লাম। নল, খাগড়া আর কেরপা গাছের গোড়ার সাথে বারবার 'উস্টা' খাচ্ছি, তবুও

ভালো লাগছে। হঠাৎ সামনে পড়ল আর এক ভ্রমণপিপাসু দল। তাদের সাথে পরিচিত হলাম। তারা আমাদের ক্যামেরাবন্দি করলো। বেশ ভালো লাগল। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এমন সময় দেখতে পেলাম পাশের কমলার চর থেকে একঝাঁক হরিণ তার বাচ্চাদের নিয়ে বের হলো। আহার করতে। এই প্রথম হরিণ দেখলাম। কিযে আনন্দ অনুভব হলো, লিখে বোঝাতে পারব না। সারাদিনের ক্লান্তি নিমিশেই যেন শেষ হয়ে গেলো। আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। হরিণ মানুষকে ভয় পায়, তাই আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল। আমরা সন্ধ্যার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে হোস্টেলে ফিরে আসলাম।

পরদিন আবার বের হলাম। এই দ্বীপে বিভিন্ন পেশার মানুষ আছে। যেমন; কৃষক-শ্রমিক, জেলে, তাঁতি, মাঝি, শিক্ষক, মৌলবী ও ব্যবসায়ী। তবে অধিকাংশ মানুষের পেশা কৃষি। কৃষিকাজ করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ কেউ জেলে, সিজন আসলে মাছ ধরে। এই দ্বীপের অধিকাংশ মানুষ খুব গরীব। দিনমজুর। অভাব অনটনে জীবন চলে। খুব সাদামাটা জীবন। প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে এরা বেঁচে আছে। নিজেরা পরিশ্রম করে খাদ্য উৎপাদ করে, নিজেদের চাহিদা মেটায়। খুব সহজ সরল এদের জীবন। জল জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা ও ঘুর্ণিঝড় এদের নিত্য দিনের সঙ্গী। সংগ্রাম করে এরা বেঁচে আছে। ঘুরতে-ঘুরতে কিছু মানুষের সাথে পরিচয় হলো। কিছু জিজ্ঞেস করলে, নিঃসংকোচে উত্তর দেয়। তাদের দুঃখের কথা বলে, অভাব অনটনের কথা বলে। নিঝুম দ্বীপে অনেক খেজুর গাছ আছে। গাছি ভাইয়েরা গাছ কেটে রস বের করে। গাছি ভাই আমাদের রস খাওয়াল। খুব ভালো লাগল। হাঁটতে হাঁটতে খুব ক্লান্ত। ক্ষুধার্ত হয়ে গেলাম। দোকানে বসে চা নাস্তা খেলাম, দোকানে থাকা লোকজনকেও খাওয়ালাম। তারা খুব খুশি হলো। ঘাটে দেখলাম কিছু ডিঙি নৌকা নোঙর করা আছে। আমরা নৌকায় উঠে বসলাম। একজন মাঝি হয়ে বৈঠা ধরলাম। কিছুসময় নদী পথে ভ্রমণ করলাম। বেশ ভালোই লাগল। এসব মনকাড়া সৌন্দর্য উপভোগ করে হোস্টেলে ফিরলাম।

নিঝুপ দ্বীপে আর একটা মজার জিনিস আছে। সেটা হলো বিশাল বড়ো একটা 'পোল', যা বানানো হয়েছে গাছের তক্তা আর বাঁশ দিয়ে। এটা আমরা ফেসবুকে দেখেছি। এখন বাস্তবে দেখব। এটা দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। তৃতীয়দিন বের হলাম আমরা এ

পোল দেখার জন্য। চলে গেলাম গন্তব্যস্থলে।

সেকী! মানুষ আর মানুষ। একদিক থেকে অন্যদিকে যাওয়া আসা করছে। আমরাও উঠলাম। যেতে যেতে যেন শেষ হচ্ছে না। তবুও যাব। সকাল দশটায় উঠলাম, বিকালে অপর প্রান্ত গিয়ে নামলাম। যদিও কষ্ট লেগেছে, তবুও ভালো লেগেছে গাছের পোলের ভ্রমণ।

নিঝুপ দ্বীপে ভ্রমণে এসে আমরা অনেক কিছু দেখলাম। খুব মজা করলাম। ভালো লেগেছে সবকিছু। তিনদিন ভ্রমণ শেষে আমরা স্ব-স্ব বাড়িতে ফিরে আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর সুবহানাল্লাহ। সুন্দর এই পৃথীবি দেখতে হলে ভ্রমণের বিকল্প নেই। তাই আমাদের উচিৎ সময় পেলেই ভ্রমণে বের হওয়া।

স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে চট্টগ্রাম

আহমাদ আদীব

আমাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা যতটা উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, অনুমতি নেওয়ার প্রক্রিয়াটা ঠিক ততটাই কঠিন। আম্মু-আব্বুকে বোঝানোটা যেন একটা যুদ্ধের মতো ছিল। বাবা প্রথমে একদমই রাজি হচ্ছিলেন না-"একা যাবে? পাহাড়ে দুর্ঘটনা হলে কী হবে?"-এমন হাজারটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু অনেক অনুনয়-বিনয়, যুক্তি-তর্ক আর কয়েকবারের প্রচেষ্টার পর শেষমেশ রাজি করানো গেল। তারপর শুরু হলো প্রস্তুতি। আমি আর আমার তিন বন্ধু বিকেলে লোকাল বাসে চড়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

পাহাড়ের আহ্বান: খৈয়াছড়া ঝর্ণার পথে প্রতারণা

চট্টগ্রামে পৌঁছানোর পর আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল মিরসরাইয়ের খৈয়াছড়া ঝর্ণা। অনেক গল্প শুনেছিলাম পাহাড় আর ঝর্ণার সৌন্দর্যের, এবার সামনে থেকে দেখার পালা। কিন্তু পাহাড়ের পথে উঠতে গিয়েই এক দল লোক আমাদের পথ আটকালো। তারা বললো, পাহাড়ে ওঠার জন্য জনপ্রতি ৩০ টাকা করে ফি দিতে হবে। আমরা প্রথমে একটু অবাক হলেও ভাবলাম, হয়তো কোনো সরকারি নিয়ম বা স্থানীয় ব্যবস্থা। তাই টাকা দিয়ে দিলাম এবং পাহাড়ে ওঠা শুরু করলাম।

পাহাড়ে ওঠা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। বিশাল বিশাল পাথরের ফাঁক গলে, কখনো পানির ওপর দিয়ে, কখনো খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যেতে হচ্ছিল। কিছু জায়গা এতটাই ভয়ানক ছিল যে, মনে হচ্ছিল পা ফসকালেই নিচে পড়ে যাবো। পথে দেখলাম, কয়েকজন লোক এক জায়গায় বসে গাঁজা টানছে। আশেপাশে কেউ নেই, একদম নির্জন জায়গা। তারা হাসাহাসি করছিল, মেয়েদের সাথে পানি খেলায় মেতেছিল। একটা লোক হঠাৎ মুখ দিয়ে হুবহু কুকুরের মতো শব্দ করলো! শুনেই গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। ওদের এড়িয়ে আমরা দ্রুত সামনে এগিয়ে গেলাম।

ঝর্ণার কাছাকাছি আসতেই এক অন্যরকম অনুভূতি হলো। চারপাশে শীতল বাতাস বইছে, ঝর্ণার ধারার শব্দ দূর থেকেই কানে আসছে। পাথরের ওপর পা রাখতেই বুঝলাম, প্রকৃতির আসল শক্তি কী! বরফঠান্ডা পানিতে নেমেই আমাদের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। বন্ধুরা সবাই সাঁতার কেটে গভীরে চলে গেল, কিন্তু আমি দূরে থাকলাম। কারণ, আমি সাঁতার জানি না!

ঝর্ণার নিচের অংশটা ছিল বেশ গভীর, পানি থৈ থৈ করছিল। একটু দূরে এক ছেলে পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে সোজা পানির গভীরে পড়ে গেল! আমি তো আতঙ্কে চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু সে দিব্যি উঠে এলো, হাসতে হাসতে বললো, "এটাই আসল মজা!" আমি মনে মনে ভাবলাম, "এই মজা আমার জন্য না!"

পাহাড় থেকে নেমে প্রতারণা ধরা পড়লো

বিকেলে পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে সেই লোকগুলোকে খুঁজলাম, যারা আমাদের থেকে ৩০ টাকা করে নিয়েছিল। কিন্তু কোথাও তাদের নাম-গন্ধ নেই! পুরোপুরি উধাও! তখন বুঝলাম, আমরা প্রতারিত হয়েছি। কিন্তু পাহাড়ি এলাকায় এসব নিয়ে বেশি কিছু বলা যায় না, তাই চুপচাপ চলে এলাম।

কুয়শার ঝর্ণায় রহস্যময় অভিজ্ঞতা

পরদিন সকালে বের হলাম একটি কম পরিচিত ঝর্ণার খোঁজে। পুরো জায়গাটা

ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল, চারপাশ নীরব, শুধু ঝর্ণার গর্জন কানে আসছিল। জঙ্গল পেরিয়ে যখন পৌঁছালাম, তখন মনে হলো, আমরা কোনো গোপন জায়গায় এসেছি। ঝর্ণার পানি এতটাই ঠান্ডা ছিল যে, শরীর কাঁপতে লাগলো।

এখানে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। আমরা যখন গোসল করছিলাম, হঠাৎই কুয়াশার মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে! আমরা ভয় পেয়ে একদম চুপ হয়ে গেলাম। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কুয়াশার ধোঁয়ায় সেই ছায়াটা মিলিয়ে গেল। পরে স্থানীয় এক দোকানে গিয়ে যখন এই ঘটনা বললাম, তখন দোকানদার রহস্যময় হাসি দিয়ে বললো, "ওই জায়গায় কেউ সহজে যায় না!" আমরা আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, কিন্তু সেই দৃশ্যটা মনে গেঁথে রইলো।

বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত: চোরাবালির ফাঁদ ও ঝাউবনের শীতলতা

এরপর গেলাম বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকতে। সেখানে গিয়ে দেখি, ভাটা চলছে। দূর-পর্যন্ত হাঁটা যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে। আমরা আনন্দে সামনে এগোলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা হলো-পা চোরাবালিতে আটকে গেল! যতই টানছি, ততই পা আরও গভীরে ঢুকে যাচ্ছে! আতঙ্কিত হয়ে সবাই মিলে টেনে তুললো, তবেই রক্ষা।

সৈকতের পাশে ছিল এক বিশাল ঝাউবন। সারাদুপুর সেখানে বসে কাটালাম। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, ঝাউগাছের দুলে ওঠা, আর দূর থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন-সব মিলিয়ে যেন অন্য এক জগতে এসে পড়েছি। এখানেই আমরা কিছু সময় বিশ্রাম নিলাম, খাবার খেলাম, আর স্মৃতির জন্য প্রচুর ছবি তুললাম।

সৈকতে স্পিডবোট ছিল, যেগুলো দিয়ে সন্দীপ যাওয়া হয়। অনেক দূর থেকে স্পিডবোটগুলো ছুটে যাচ্ছিল, আর জলের ওপর একরকম শিহরণ জাগানো দৃশ্য তৈরি হচ্ছিল। আমরা প্রথমে ভাবলাম, স্পিডবোটে উঠবো, কিন্তু বাজেট ছিল সীমিত। তাই দূর থেকে শুধু দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

জোয়ার আসছে!

দুপুরের পর থেকেই বাতাসের মধ্যে এক অদ্ভুত শো শো শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

হঠাৎ আবুল বাশার ভাই দৌড়ে এসে বললেন, "চলো, দেরি করলে বিপদ হতে পারে!" আমরা তখনো পুরো বিষয়টা বুঝতে পারিনি। একটু পরই দেখি, সমুদ্রের পানি হু হু করে বাড়ছে! জোয়ার এসে গেছে!
দ্রুত সৈকত ছাড়তে হলো। কিছু সময় পরই জায়গাটা পানির নিচে চলে গেল! বুঝলাম, দেরি করলে হয়তো আমরা আটকে পড়তাম।

সফরের সমাপ্তি: ট্রেনে ফিরে দেখা স্বপ্ন

তিন দিনের দারুণ ভ্রমণের শেষে আমরা চিনকি আস্তানা রেলস্টেশন থেকে চাঁদপুরগামী ট্রেনে উঠলাম। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, ধীরে ধীরে চট্টগ্রামের প্রকৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়, ঝর্ণা, সমুদ্র আর মানুষের আতিথেয়তা-সবকিছুই রেখে যাচ্ছি পেছনে, কিন্তু স্মৃতিতে তা চিরস্থায়ী হয়ে থাকলো।
এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম বড় ভ্রমণ। নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন চ্যালেঞ্জ, আর কিছু রহস্যময় মুহূর্ত-সব মিলিয়ে একটা দারুণ রোমাঞ্চকর সফর।
কখনো যদি সুযোগ হয়, আবার কি সবাই একসঙ্গে যাবো? হয়তো বা!

সহসম্পাদক, তারুণ্যের তারান্নুম

সৈকতের বালুচরে হারিয়ে যাওয়া শৈশব

উম্মুল বারাকাহ আমাতুল্লাহ শারমিন

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারির কথা। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। বাবা বললেন,
এবার আমরা ভ্রমণে যাবো। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। ভ্রমণের কথা শুনে আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম;
– আমরা কবে যাচ্ছি?
– আগামী সোমবার।

অপেক্ষা করতে থাকলাম। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সোমবার আমরা বাসে উঠলাম। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে গেলাম ঢাকার সদরঘাট। বিশাল আকারের লঞ্চ। আমাদের পুরো পরিবারের জন্য বাবা দুটো কেবিন ভাড়া করেছিলেন। লঞ্চ ছাড়ার পর আমি আর আমার বোন সুমাইয়া নদীর চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ছাদে উঠে এলাম। ঝিরঝির বাতাস বইতেছিল। নীল আকাশ ভরা তারার ঝিকিমিকি আলো। চাঁদের রূপালী আলো ছড়িয়ে পড়ছিল ঢেউয়ের দোলায়। দূরের গ্রাম গুলো কালো রেখার মতো দেখা যাচ্ছিল। মুক্ত আকাশের নিচে আমি যেন এক মুক্ত পাখি। কিন্তু লঞ্চ মেঘনায় প্রবেশ করার পর আমাদের ভয় লাগা শুরু হলো। দুজনে নিচে নেমে এলাম।

গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। ঘুম ভাঙলো লোকদের চিৎকার শুনে। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। শুনলাম আমাদের লঞ্চ পদ্মা-মেঘনার মিলনস্থলে ঢুকে পড়েছে। এখন বের হতে পারছে না। সবাই দু'আ ইউনুস পড়তে লাগলো। আমিও পড়তে পড়তে রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম পদ্মার ঘোলা পানি আর মেঘনার স্বচ্ছ পানির স্রোত একটার সাথে আরেকটা মিশে যাচ্ছে। আমার মনে হলো

পদ্মা-মেঘনা দুজনই যেন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। প্রতিপক্ষকে উভয়েই ধরাশায়ী করতে চায়। আমিও দেখতে লাগলাম, কে যুদ্ধে বিজয়ী হয়। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকার সাহস হলো না। ভয় লাগা শুরু হলো। ভাইয়া বললো, লঞ্চ নিরাপদ দুরত্বে সরে এসেছে, ভয় নেই।

বাবা ঘুমাতে বললেন। ঘুমিয়ে পড়লাম। ফজরের সময় বাবা সবাইকে জাগিয়ে দিলেন। উঠে নামাজ পড়লাম। নামাজ পড়ে দেখলাম পটুয়াখালী এসে গেছি। সবাই বাসস্ট্যান্ডের কাছে এসে নাস্তা সেরে নিলাম। বাস ছাড়লো সকাল আটটায়। হালকা কুয়াশায় ঢাকা নদীকে তখন অপূর্ব লাগছিল। আমরা বেলা এগারোটায় কুয়াকাটা পৌঁছালাম। অল্পকিছু পথ হেঁটে সমুদ্র সৈকতে পা রাখলাম। আমি বড় আপুর হাত ধরে হাঁটছিলাম যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল পানি আর পানি চোখে পড়লো। ভাইয়া বললো, একটু আগে ভাটা ছিল। এই দেখো বালু ভিজে গেছে। আমি মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলাম। কি বিস্ময়কর আল্পনা! আমরা পানির কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। কি বিশালতা সাগরের। বড় বড় ঢেউ! মনে হয় আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কি ভয়ঙ্কর গর্জন! যেন গ্রাস করে ফেলবে। ভাইয়ারা স্বচ্ছ পানিতে পা ভিজাচ্ছিল। আমিও বাবার হাত ধরে পানিতে নামলাম। কিছুটা দূরে নোঙ্গর করে ছিল একটি বড় নৌকা। তার কাছাকাছি আরো কয়েকটি ছোট নৌকা। আমার মনে হলো, অদূরে আকাশ আর সাগর একাকার হয়ে মিশে গেছে।

আমরা অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিশাল সমুদ্রের অনির্বচনীয় রূপ হৃদয়ে ধারণ করে নিলাম।

– ভাইয়া বললো, এখনো সমুদ্রের আসল রূপ দেখার বাকি আছে।
– কি সেটা?
– সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়।

আমরা অনেক প্রজাতির মাছ দেখলাম, যার মধ্যে সবুজ রঙের কিছু মাছ ছিল। আপু বললো, এগুলো শাপলা মাছ। আমরা সৈকতের লেবু বাগানে গেলাম।

চোখে পড়লো কেওড়া আর গেওয়ার চোখা শিকড় যা উপরে উঠে ছিল।

ভাইয়া বললো, এ যেন এক খন্ড সুন্দরবন। আমরা অল্প পানিতে পা ভিজিয়ে চলছিলাম। খুব ভালো লাগছিল এভাবে চলতে।

সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার জন্য আমরা সৈকতের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। সূর্য তার গোলাপী আভা ছড়িয়ে দিচ্ছিল ঢেউয়ের দোলায়। ধীরে ধীরে লাল আকৃতি ধারণ করছিল। গাছে- গাছে, ঘরের দেওয়ালে, মানুষের অবয়বে, সমুদ্রের স্বচ্ছ জলে যেন তারই সঞ্চারণ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল বিদায় বেদনার রং। সমুদ্র যেন এ বিদায়ের ভার বহন করতে গিয়ে নিজেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ছিল। সবাই ছবি তুলে স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাচ্ছিল এই অসাধারণ মূহুর্ত। দেখতে দেখতে সূর্যের লাল পদ্মটা যেন টুপ করে পানিতে পড়ে গেল আর ডুবতে থাকলো। লাল পদ্মের রং আকাশে সাগরে একাকার হয়ে গেল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত আমরা মুগ্ধ হয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করলাম।

কিছুক্ষণ পরই জোয়ার শুরু হলো। অমাবস্যার রাতে সমুদ্রের গর্জন। বিশাল আকারের ঢেউ ধেয়ে আসছিল সমুদ্রের দিকে। মন চাচ্ছিল সারারাত অবলোকন করি । কিন্তু সাগরের গর্জন ক্রমশ বেশি হওয়ায় আমরা হোটেলে ফিরে আসলাম।

ভোর বেলা ফজরের নামাজ বের হলাম নতুন কিছু জানার উদ্দেশ্যে। সূর্যোদয়ের দৃশ্য হৃদয়ে ধারণ করার জন্য সৈকতে পৌঁছালাম। কুয়াশায় ঢেকে ছিল সাগর। তবুও পূর্ব দিগন্তে আগুনের শিখা ছড়িয়ে ছিল। একটু পরেই লাল চাকতির একটা প্রান্ত সমুদ্রের জল মন্থন করে জেগে উঠলো। একটু একটু করে সেটা ক্রমশ বড় হচ্ছিল আর লালচে থেকে লাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। হঠাৎ এই বৃত্তাকার লাল পুরো সূর্যটাই জলের ভেতর থেকে বীর বেশে উঠে এলো। কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে আমাদের দৃষ্টিকে রক্তাভ করে নিল।

আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সৈকতের বালুর উপর আমি আর সুমাইয়া ছোটাছুটি করতে লাগলাম। হঠাৎ বড় ভাইয়া একটা ধূসর ঘোড়া নিয়ে এলো। এমনিতেই ঘোড়া আমার খুব পছন্দ তার

উপর আবার ধূসর ঘোড়া। এতো আর ছাড়া যায় না। ভাইয়া ঘোড়ায় চড়ে বসলো। কিছুদূর ঘুরে এসে সুমাইয়াকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিলো। সে কিছুক্ষণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে নেমে পড়লো। অতঃপর আমায় বসিয়ে দিলো বাবা। আমি ঘোড়ার লাগাম চাইলাম ভাইয়া দিলো না। বললো, দুষ্ট ঘোড়া। লাগাম ছেড়ে দিলে ওর পিঠ থেকে ফেলে দিবে।

ভাইয়া ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে চললো আর আমি ঘোড়ার পিঠে বসে রইলাম। নিজেকে মনে হতে লাগলো উহুদের কোনো যোদ্ধা নারী। বাবাকে বললাম, আমি উহুদের নুসাইবা বিনতে কাব রা.। বাবা হাসলেন মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলেন। একটু পর ঘোড়া থেকে নেমে আবার সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে মনোনিবেশ করলাম। বেলা দশটা নাগাদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হোটেলে ফিরতে হলো। খাওয়ার সময় সমুদ্রের তাজা মাছ ভাজা। খেতে অনেক ভালো লাগলো। সবাই বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হয়ে আরেক দফা রাখাইন পল্লীতে ঘুরে অশ্রুসিক্ত নয়নে সমুদ্রকে বিদায় জানিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম।

এরপর কেটে গেল বহু দিন মাস। কেটে গেল আট বছর। হারিয়ে গেল শৈশবের সাথে জীবনের রঙিন দিনগুলো। তবে কুয়াকাটার সে মাধুরী রূপ এখনো আমার হৃদয় পটে অমলিন অভাবনীয় চিত্তে বসবাস করছে। কুয়াকাটা নামটি শুনলেই আমার হৃদয় আকুল হয়ে উঠে আরেকবার ওর কোলে বসার। ওর মনোমুগ্ধকর রূপ হৃদয়ে আরেকবার ধারণ করার। কিন্তু পরিস্থিতি এখন আর আমাকে এ অনুমতি দেয় না। এখন বাবা নিজের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত আর ভাইয়ারা তো গায়রে মাহরাম। এখন বড় হয়েছি ওদের সাথে দেখা করাই যায় না আবার ভ্রমণ এ কিভাবে সম্ভব! তবে মনের গহীনে এখনো কোথাও নিভু নিভু আশার প্রদীপ জ্বলে বিশ্ব ভ্রমণের। আরেকবার সমুদ্রের বালুচরে বসে পড়ার। কান পেতে শুনবো সমুদ্রের গর্জন, নদীর কলকল ধ্বনি। পাহাড়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দিবো, হারিয়ে যাবো অরণ্য গভীরে। মরুর বুকে দীর্ঘ সফর শেষে বসে পড়বো পাহাড়ি কোনো এক ঝর্ণার কাছে। খর্জুর বিথীর শীতল ছায়ায় জুড়াবো হৃদয় মন। অরণ্য গভীরে হারিয়ে যাবো শুনবো পাখির গান। আঁকাবাঁকা পথ ধরে হাটবো অনন্তকাল। ফের ছুটে যাবো পটুয়াখালীর সেই ভূবন মোহিনী কুয়াকাটায়। সাগরকন্যার সাথে সাক্ষাৎ করবো। সূর্যাস্তের সাথে সাথে ডুবে যাবে দিনের সকল দুঃখবেদনা। আরেকবার পূর্ণিমার রাতে উপভোগ করবো সাগরকন্যার মাধুরী রূপ। আবারও সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ

করবো সেই ফেব্রুয়ারির, যে ফেব্রুয়ারিতে বাবার হাত ধরে সাগরপাড়ে হাঁটছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমায় অনুমতি দিবে কি? নিয়তি কি আমায় সুযোগ করে দিবে আরেকবার সাগরকন্যার সাথে সাক্ষাতের। আমি সাগরের জল ছুঁয়ে বলবো, তোমার কি আমায় মনে আছে মায়াবিনী? আমার ছোটবেলায় তুমি একবার আমায় ছুঁয়ে দিয়েছিলে? তুমি তো বড্ড স্বার্থপর। আমার অনুপস্থিতিতে আমায় ভুলে গিয়েছিলে তাই না? কিন্তু আমি তোমায় ভুলিনি এই দেখো আট বছর পরেও ছুটে এসেছি তোমার বুকে।

জানি না আমার চাওয়া পূরণ হবে কিনা। কুয়াকাটা! সাগরকন্যা! তুমি আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকবে আজীবন। তোমার স্মৃতি কখনো পুরনো হবে না। হবে না মলিন। যতদিন পর্যন্ত আমি দ্বিতীয়বার তোমার সাথে সাক্ষাৎ করিনি ততদিন পর্যন্ত তুমি নবরূপে বারবার আমার কল্পনায় ধরা দাও। আমি তোমার স্মৃতিকে কখনোই মলিন হতে দিব না। তুমি চিরসবুজ, তুমি অক্ষয় রবে আমার স্মৃতিতে।

কুড়িগ্রাম জেলা

নিঝুম দ্বীপের সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা

মুহা. আমিনুল ইসলাম সৈকত

বাংলাদেশের পর্যটনের অফার সম্ভাবনা নিঝুম দ্বীপ। নিঝুম দ্বীপের প্রাকৃতিক নানান মনোরম পরিবেশ যে কারো নজর কেড়ে নেয়। দ্বীপের প্রাকৃতির সৌন্দর্য দেখলে মনে হবে এ এক স্বর্গভূমি। যেন প্রকৃতির সব রং মিশে একাকার হয়ে গেছে এখানে। পৃথিবীতে খুব কম জায়গা আছে যেখানে একসাথে বন, নদী, লেক ও বীচের দেখা মিলে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার হলেও নিঝুম দ্বীপ সৌন্দর্যে তার থেকে কোন দিকে কম নয়। মূলত কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন কিংবা কুয়াকাটায় শুধু কিনারে বসে সাগরের ঢেউ দেখার সুযোগ থাকে মাত্র। কিন্তু নিঝুম দ্বীপে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউয়ের পাশাপাশি বিশাল ম্যানগ্রোভ বন, আছে বালুকাময় সৈকত এবং জঙ্গলের পাশ দিয়ে বয়ে চলা খাল বা লেক। নিঝুম দ্বীপে ঘুরতে আসলে যে কেউ প্রকৃতির সাথে মিশে যাবে অনায়াসে । এখানে শোনা যায় হাজার রকমের পাখিদের কিচিরমিচির এবং দেখা মিলে দলবদ্ধ চিত্রা হরিণের।

নিঝুম দ্বীপ নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত। এটি নোয়াখালী জেলা সদর থেকে প্রায় ৯১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । ২০১৩ সালে দ্বীপটি জাহাজমারা ইউনিয়ন হতে পৃথক হয়ে

হাতিয়ার ১১তম ইউনিয়ন হিসেবে স্বতন্ত্র ইউনিয়নের মর্যদা লাভ করে। দ্বীপটি তার নামের মতই নিঝুম। প্রায় ৯১ বর্গ কিলোমিটার (১৪,০৫০ একর) আয়তনের এই দ্বীপটি কমলার চর, বল্লার চর, চর ওসমান ও চর মুরি নামের চারটি দ্বীপ ও কয়েকটি চরের সমন্বয়ে গঠিত। জোয়ার ভাটার এই দ্বীপের এক পাশ ঢেকে আছে পলিমাটি ও ম্যানগ্রোভ বন, অন্য পাশে আছে বিশাল বালুকাময় সৈকত। ১৯৫০ সালের দিকে সমুদ্রবক্ষে জেগে ওঠা নিঝুম দ্বীপের পূর্বনাম ছিলো চর-ওসমান / বাউল্লার চর। লোকমুখে শোনা যায় ওসমান নামের একজন বাথানিয়া তার মহিষের বাথান নিয়ে প্রথম নিঝুমদ্বীপে বসতি গড়েন। তখন এই নামেই এর নামকরণ হয়েছিলো। দ্বীপের মাটি চিকচিকে বালুকাময়, তাই জেলেরা এর নামকরণ করে বালুর চর। স্থানীয় লোকজন এই দ্বীপকে বাইল্যার ডেইল বা বাল্লারচর বলেও ডাকত। কথিত আছে ১৯৭০ এর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে দ্বীপটিতে কোন প্রাণের অস্তিত্ব ছিলনা। ঘূর্ণিঝড়ের পরে তৎকালীন হাতিয়ার জননন্দিত নেতা আমিরুল ইসলাম কালাম সাহেব দ্বীপটিতে পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন যে কোন প্রানের অস্তিত্ব নেই, তাই তিনি আক্ষেপের সুরে বলে ছিলেন হায় নিঝুম! সেখান থেকে দ্বীপটির নতুন নাম হয় নিঝুম দ্বীপ।

নিঝুম দ্বীপে রয়েছে ৯টি গুচ্ছ গ্রাম। ১৯৮৮ সনে সরকারি ভাবে ৯টি গুচ্ছগ্রাম সৃষ্টি করে ৫৪৬টি পরিবারের বসতির ব্যাবস্থা করা হয়। এই গুচ্ছগ্রাম গুলো হলো, বসুন্ধরা, বাতায়ন, আনন্দ, আগমনি, ছায়াবীথি, ধানসিঁড়ি, যুগান্তর, সূর্যোদয় ও পূর্বাচল। এই গুচ্ছ গ্রাম ছাড়াও দ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিস্তির্ণ জনপদ। নিঝুম দ্বীপের জনসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। দ্বীপের ৭০ ভাগ মানুষ মৎস্যজীবী। তারা গভীর সমুদ্র ও নদীতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। বাকি ৩০ ভাগ মানুষ কৃষিজীবী। দ্বীপের মানুষগুলো অনেক পরিশ্রমী। শিক্ষা ব্যাবস্থায় নিঝুম দ্বীপে রয়েছে ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কয়েকটি নূরানী মাদ্রাসা।

স্কুলগুলোর নাম হল বন্দর টিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিঝুম দ্বীপ বিদ্যানিকেতন, শতফুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নিঝুম দ্বীপ জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাথমিক

বিদ্যালয়গুলো সাইক্লোন শেল্টারে অবস্থিত। ৭০ দশকে বনবিভাগ নিঝুম দ্বীপের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে এই দ্বীপের বনে চার জোড়া হরিণ ছেড়ে দেয়া হয়, যা বর্তমানে কয়েক হাজারের উপর। এছাড়াও বন্যপ্রাণী (হরিণ) নিধনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বনবিভাগ কতৃপক্ষ । ২০০১ সালের ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার পুরো দ্বীপটিকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করে। এর পর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পর্যটকরা এ দ্বীপে আসে প্রকৃতির মাঝে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে।

নিঝুম দ্বীপের একদিকে মেঘনা নদী আর তিন দিকে বঙ্গোপসাগর ঘিরে রেখেছে। দ্বীপের বিশাল এলাকা পলিমাটির আবরণে আচ্ছাদিত যা প্রতিদিন জোয়ারের নোনা পানিতে ডুবে যায় এবং ভাটায় শুকিয়ে যায়। এখানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো কেওড়া বনে লুকিয়ে থাকা চিত্রা হরিণ এবং ১২ কিলোমিটার বিস্তৃত বালুকাময় বীচ। নিঝুম দ্বীপকে কেওড়া গাছের অভয়ারণ্যও বলা চলে, কারণ মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত কেওড়া গাছের সারি । এছাড়াও এ দ্বীপে রয়েছে প্রায় ৪৩ প্রজাতির লতাগুল্ম এবং ২১ প্রজাতির অন্যান্য গাছ। জীব বৈচিত্রে নিঝুমদ্বীপে কোনো হিংস্র প্রাণী নেই। আছে কেবল হরিণ, মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বনবিড়াল, শেয়াল। এখানে স্থানীয় লোকদের মহিষের বড় বড় বাথান রয়েছে। এসব মহিষের দুধ থেকে তৈরী হয় দধি । কিন্তু প্রক্রিয়াজাতকরণের আধুনিক কোন মাধ্যম না থাকায় তেমন সাড়া পায়না বাথান মালিকরা। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এখানে দুগ্ধ খাতে বিপুল অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া সম্ভব হবে। প্রাণীদের মধ্যে চিত্রা হরিণই নিঝুম দ্বীপের প্রধান বন্য প্রাণী। একর প্রতি চিত্রা হরিণের ঘনত্ব সুন্দরবনের চেয়ে তিনগুন বেশী। বন বিভাগের হিসাব মতে নিঝুম দ্বীপে হরিণের সংখ্যা প্রায় ২২ হাজার। নিঝুম দ্বীপের মতো দেশের অন্য কোথাও একসাথে এত চিত্রা হরিণ সাধারণত দেখা যায় না। এখানে বাঘের মতো কোন মাংসাশী প্রাণী না থাকায় দ্রুত গতিতে হরিণের বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। মাঝে মাঝে হরিণ শাবকের বিপদের কেন্দ্র হয়ে দাড়ায় কিছু ধূর্ত শিয়াল। নিঝুম দ্বীপে আরো আছে বন্য শেয়াল, বানর, উদবিড়াল ইত্যাদি। সরীসৃপের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সাপ, দেশি গুইসাপ ও অন্যান্য জাতের সামুদ্রিক কচ্ছপ। সামুদ্রিক কচ্ছপের গুরুত্বপূর্ণ প্রজননস্থল এই নিঝুম দ্বীপ।

নিঝুম দ্বীপে দেখা মিলে প্রায় ৩৫ প্রজাতির পাখির। এসব পাখির মধ্যে রয়েছে, চার ধরনের বক (ধূসরবক,নিশি বক, দেশি কানিবক, গোবক),ঘুঘু, শালিক, দোয়েল, দেশি পানকৌড়ি, সামুদ্রিক ঈগল, শঙ্খচিল, কাদাখোঁচা, বালিহাঁস, কালোহাঁস, কোঁড়া, তিল লালপা, তিল সবুজপা,দেশি গাঙচষা ইত্যাদি।

শীতকালে নিঝুম দ্বীপে সরালি, জিরিয়া, লেনজা, পিয়ং, রাঙ্গামুড়ি, চখাচখি, ভূতিহাঁস, রাজহাঁস, কাদাখোঁচা, বাটান, জিরিয়া, গুলিন্দা, কাস্তেচরা, পেলিক্যান ইত্যাদি হাজারো অতিথি পাখির আগমন ঘটে। ইংল্যান্ডের নর্থ হ্যামশায়ার, সাইবেরিয়া, আসাম, ফিলিপিন্স, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, এন্টার্কটিকা, চীনের লাদাখ অঞ্চলে শীত যখন মাইনাস শূন্য ডিগ্রিতে নেমে আসে, শীতের প্রকোপে পাখির দেহ হতে পালক খসে পড়ে, প্রচণ্ড তুষারপাতে প্রকৃতির নানান বিরূপ আচরণে সে দেশের পাখিগুলো তখন যেসব দেশে অপেক্ষাকৃত কম শীত এবং খাদ্য ও নিরাপত্তার অভাবে সেসব দেশ ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে অতিথি হয়ে আসে। নাতিশীতোষ্ণ দেশ হিসেবে এসব পাখি বাংলাদেশসহ এশিয়ার কিছু দেশ বেছে নেয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি এই দুই মাসে সবচেয়ে বেশি পাখি আসে নিঝুমদ্বীপে। জোয়ারের পানিতে বয়ে আসা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এদের একমাত্র খাবার। দ্বীপের চারিপাশে বিপুল মৎস্য ভান্ডার। এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক চিংড়ি জোন। এই দ্বীপে মাছের মধ্যে রয়েছে জাতীয় মাছ ইলিশ, লইট্যা, বাটা, পোয়া, চিংড়ি, রিক্সা, সুরমা, রুপচাঁদা, চেঁউয়া সহ নদী ও সামুদ্রিক নানান মাছ। জেলেরা বিশেষ করে চেঁউয়া মাছের শুঁটকি তৈরি করেন যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাইকারি বিক্রি করা হয়। বিশেষ করে এই শুটকি থেকে হাস মুরগির ফীড তৈরী করা হয়। এছাড়াও এখানে রয়েছে মারসৃপারি নামে একধরনের মাছ যাদেরকে উভচর প্রাণী বলা হয়। ৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে এই মারসৃপার, ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা হয়। বর্ষা মৌসুমে ইলিশের জন্য নিঝুম দ্বীপ বিখ্যাত।

নিঝুম দ্বীপের দর্শনীয় স্থানগুলো হলো;

ম্যানগ্রোভ বন: পাঁচ দশক আগে ১৯৭৩ সালে নিঝুম দ্বীপে বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। একটি জরীপ থেকে জানা যায় এখানে বনভূমির পরিমাণ ছিল ১২০০০ একর, যা ভূমিদস্যু অসাধু লোকের

কারণে কমতে শুরু করেছে। উদ্ভিদের মধ্যে এ বনে রয়েছে কেওড়া, গেওয়া, কাঁকড়া, গোলপাতা, বাইন, ঝাউ ইত্যাদি। প্রকল্প এলাকা বেষ্টিত কেওড়া বন ও লতাগুল্মের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে হরিণের পাল। হরিণ খুঁজতে কিংবা গহীন ম্যানগ্রোভ বনে শ্বাসমূল কিংবা ঠেস মূলের মধ্যে বিচরন করে ভ্রমনপিপাসুরা এক অন্যরকম অনুভূতি খুজে পায় ।

বীচ: বীচের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামার বাজার সী বীচ। বীচটি প্রায় ৮ কিলোমিটার (৭.৯১) দীর্ঘ। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অবলোকন করা যায়। আরও আছে ভার্জিন সী-বীচ, চোয়াখালি বীচ ইত্যাদি। সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্তের দৃশ্যটা প্রাণ কেঁড়ে নেয়ার মতো।

লেক বা খাল: চৌধুরীর খাল, পটকাখালী খাল, সোয়ানখালী খাল, ডুবাই খাল, ধামসাখালী খাল, ভদ্রোখালী খাল, কাউনিয়া খাল, লেংটা খাল

কমলার চর: ঘূর্ণিঝড়ের পরে জাহাজ থেকে এই চরে কয়েক বাক্স কমলা পড়ে থাকতে দেখে এর নামকরণ করা হয় কমলার চর। এই চরে কমলার খালে বর্ষায় অনেক ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। এছাড়াও এর আশে পাশে জেগে উঠা দ্বীপগুলো সুন্দর।

চৌধুরী খাল: চৌধুরী খালের দৃশ্য অনেক সুন্দর। খালের দুইপাশে কেওড়ার শ্বাসমূল ও অন্যান্য লতাগুল্ম চিরসবুজ প্রকৃতিকে স্বরণ করিয়ে দিবে।

কবিরাজের চর: কবিরাজের চর ম্যানগ্রোভ বনে বেষ্টিত। এখানেও হরিণ দেখা মিলে।

দমার চর: বঙ্গোপসাগরের সম্প্রতি এ সমুদ্র সৈকতটি জেগে উঠেছে। এর দৈর্ঘ্য সাড়ে চার কিলোমিটার। সৈকতটি একেবারে ধবধবে সাদা বালুকাময়য় । নিঝুম দ্বীপের লোকজন এবং মাছ ধরতে যাওয়া লোকেরা এই সৈকতকে বলে 'দেইলা' বা বালুর স্তুপ। একে এখন ডাকা হচ্ছে 'ভার্জিন সী বীচ'' নামে।

যাতায়াত:

নিঝুম দ্বীপে যাতায়াত আগের চেয়ে এখন অনেক উন্নত। নদীপথে রাজধানী ঢাকার সদরঘাট থেকে হাতিয়াগামী লঞ্চে করে হাতিয়া হয়ে নিঝুম দ্বীপ। সড়ক পথে বাংলাদেশের যে প্রান্ত (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ইত্যাদি) থেকে নিঝুম দ্বীপ ভ্রমন করতে হলে প্রথমে তাকে সড়ক পথে নোয়াখালী মাইজদী/ সোনাপুর আসতে হবে। তারপর বাস বা সি এন জি যোগে যেতে হবে চেয়ারম্যান ঘাট। সেখান থেকে ট্রলার, স্পীড বোট বা সী-ট্রাক যোগে হাতিয়া হয়ে নিঝুম দ্বীপ।

নিঝুম দ্বীপে পর্যটকদের অবকাশ যাপনের জন্য কতগুলো হোটেল ও রিসোর্ট গড়ে উঠেছে । যথা;
১. নিঝুম রিসোর্ট (অবকাশ হোটেল), নামার বাজার ২. হোটেল শাহিন,নামার বাজার ৩. হোটেল সোহেল,নামার বাজার ৪. মসজিদ বোর্ডিং, নামার বাজার ৫. নিঝুম ড্রিম ল্যান্ড রিসোর্ট, বন্দরটিলা ৬. হোটেল দ্বীপ সম্পদ, নামার বাজার ৭. হোটেল শেরাটন, বন্দরটিলা বাজার ৮. জেলা পরিষদ ডাক বাংলো ৯. বন বিভাগের ডাকবাংলো ১০. মাহমুদ বোডিং। বেশিরভাগ রিসোর্টগুলো নামার বাজারে অবস্থিত।

ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে সুন্দরবনের পরে নিঝুম দ্বীপকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে ধরা হয়। নিঝুম দ্বীপে প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে বলে বিভিন্ন সংস্থার জরিপ থেকে জানা যায়। একনেকে প্রস্তাবিত বরাদ্দ অনুযায়ী ২০২৩ সালে নিঝুম দ্বীপ সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পর্যটকদের সুবিধার্থে এই দ্বীপে রেস্তোরাঁ, কটেজ ও করুজ ভেসেল সংগ্রহে প্রায় ৫০ কোটি টাকার আরো একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে পর্যটক সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। নোয়াখালী জেলা ব্রান্ডিং নাম নিঝুম দ্বীপের দেশ বলা হলেও নিঝুম দ্বীপের উন্নয়নে জেলা পরিষদের তেমন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও নোয়াখালীর একমাত্র দর্শনীয় স্থান বললে নিঝুম দ্বীপ বলা চলে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরেকটু নিরাপদ ও উন্নত করা গেলে এবং দ্বীপটিকে সরকারি উদ্যোগে সুন্দরভাবে সাজানো গেলে ইনশাআল্লাহ, নিঝুমদ্বীপকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না।
উন্নত দেশগুলোর দিকে খেয়াল করলে যেমন দুবাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও এতো উন্নত ছিলো না। কেবল ধূ ধূ মরুভূমি ছিলো। আজ তারা পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে উন্নত ও আধুনিক দেশের কাতারে পৌঁছে গেছে। ম্যানগ্রোভ বন, বিস্তীর্ণ বালুরাশি, শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রা সব মিলিয়ে এই দ্বীপ বৈচিত্রময়। আশা করি ভবিষ্যতে নিঝুম দ্বীপ দেশের পর্যটন শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

হাতিয়া, নোয়াখালী

স্বপ্নের সাজেক, ভাবনার উদ্ভেদ

আনিসুর রহমান হাসান

মানুষের স্বপ্ন তার শিথানে সুতোয় গাঁথা থাকে। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘরে সে স্বপ্ন নড়েচড়ে ওঠে, আমরাও আর ঘুমাতে পারি না। কৈশোরেই সর্বপ্রথম জানতে পারি সাজেক ভ্যালি সম্পর্কে। সাজেকের সৌন্দর্য; হাত বাড়ালে মেঘ ছোঁয়ার গল্প, এসব শুনে তখনই মনে স্বপ্ন বাঁধি-আমিও একদিন সাজেক যাবো, হাত বাড়িয়ে মেঘ ছোঁবো। কিন্তু সে স্বপ্ন দীর্ঘকাল যাবত অধরাই থেকে যায়। মাঝে মাঝে নড়াচড়া করত, কিন্তু সাজেকের দূরত্ব কিংবা সময়-সুযোগেরের অভাবে যাওয়া হচ্ছিল না। সালটা ২০২১ঈ.। শীতকাল। বার্ষিক সভা উপলক্ষে মাদ্রাসা ছুটি। আমি তখন হাটহাজারী মাদ্রাসায় ইফতা বিভাগে পড়ি।

ভৌগোলিক দিক থেকে হাটহাজারী মাদ্রাসা সাজেকের খুব কাছে অবস্থিত। আমরা কয়েকজন সহপাঠী মিলে পরিকল্পনা করি, এ ছুটিতে কোথাও ঘুরতে যাবো। তখনই আমার শিথানের জীবন্ত স্বপ্ন নড়ে ওঠে। মেঘরাজ্য সাজেক

আমাকে কাছে ডাকতে থাকে। আমার মন তার ডাকে সাড়া দিতে উতলা হয়ে পড়ে। আমি সবাইকে পরামর্শ দেই, আমাদের এবারের ভ্রমণ প্যালেস হবে সাজেক ভ্যালি। সবাই তাতে ঐকমত্য হয়। আমরা সাজেক ভ্যালি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেই। ভ্রমণের আবশ্যিক বিষয়, যেখানে যাচ্ছে, তার নানা বিষয় সম্পর্কে জেনে নেওয়া। আসা-যাওয়ার পথ, ভাষা বৈচিত্র, বিশেষ স্থান, বিশেষ খাদ্য। এসব জানা থাকলে ভ্রমণ হয় দ্বিগুণ উপভোগ্য।

পরদিন মধ্যরাতে জামিয়া চত্ত্বর থেকে মাইক্রোবাসে করে আমরা রওনা হই খাগড়াছড়ির দিকে। রাত আর কুয়াশার অন্ধকারের ফাঁকে দুচোখ জুড়ে আলো জ্বালছিল স্বপ্নপূরণের। ঠাণ্ডায় শরীর জড় হয়ে আসলেও শরীরে বাড়তি উত্তেজনা কাজ করছিল। পূবাকাশে সূর্য উঁকি দেওয়া ভোরে আমরা পৌঁছে যাই খাগড়াছড়ি। সেখানে আদায় করি ফজরের সালাত। নামাজের পর সকালের নাস্তা সেরে ভাড়া করি চান্দের গাড়ি। খাগড়াছড়ি থেকে সাজেকের গাড়িগুলো দীঘিনালা হয়ে যায়। দীঘিনালার পরের আর্মি ক্যাম্প থেকে আর্মি স্কর্ট দিয়ে প্রতিটি গাড়ি সাজেক নিয়ে যায়। স্কর্ট ছাড়ে সকাল ৯:৩০ মিনিট এবং দুপুর ২:৩০ মিনিটে। আমরা পরিকল্পনা করি বিকেলের স্কর্টে সাজেক যাবো, তার আগে ঘুরে দেখব খাগড়াছড়ির আলুটিলা গুহা, রিচাং ঝর্ণা। যেই ভাবা, সেই কাজ। প্রথমে বাইকে করে রিচাং ঝর্ণা, তারপর সেখান থেকে আলুটিলা গুহা, এরপর হর্টিকালচার পার্ক-এর মাঝে দুপুর হয়ে যায়। দুপুরের ভোজ শেষে তৈরি হই চান্দের গাড়ি আরোহনের।

খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক সাধারণত কয়েকটি বাহনে যাওয়া যায়। চান্দের গাড়ি, মাহিন্দ্র, বাইক, হাইচ বা মাইক্রো। তবে ভ্রমণে আনন্দের জন্য বেশিরভাগ মানুষই চান্দের গাড়ি ও মাহিন্দ্র নেয়। ছয় থেকে বারোজনের জন্য চান্দের গাড়ি আর ৪/৫ জন হলে মাহিন্দ্র বেস্ট। আমরা যেহেতু এগারোজন ছিলাম, তাই আমাদের জন্য চান্দের গাড়িই বেস্ট অপশন ছিল। তাই সাত হাজার টাকা দিয়ে এক রাতের প্যাকেজে একটি চান্দের গাড়ি নিয়ে নেই।

বেলা তিনটার দিকে দীঘিনালা থেকে সারি সারি চান্দের গাড়ি, হাইচ, মাহিন্দ্র রওনা করে সাজেকের দিকে। সবুজ অরণ্যের বুক চিড়ে উঁচুনিচু পথ দিয়ে ছুটছে গাড়ি। গাড়িগুলো যখন উঁচু থেকে নিচুতে দ্রুতগতিতে নামছি; তখন ভয়ে শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, পথভ্রষ্ট হলে সোজা হাজার ফুট নিচে। দেহে রুহ তো দূর কী বাত, মৃত দেহখানিই পরিবারের কাছে পৌঁছতে

পারা ভাগ্যের ব্যাপার। আবার ঢালু দিক থেকে যখন গাড়ি উঁচুর দিকে উঠছিল, তখন চান্দের গাড়িটাকে সবুজে ভাসা রকেট মনে হচ্ছিল। সব মিলিয়ে যাত্রাপথ ছিল ভারী রোমাঞ্চকর ও অ্যাডভেঞ্চারে ভরপুর।

দুইঘন্টার যাত্রা শেষে আমাদের চান্দের গাড়ি যখন সাজেক পৌঁছে, তখন আসরের শেষ ওয়াক্ত। ঐসময় সাজেকে একটি মাত্র মসজিদ ছিল। তবে সে এলাকায় ছিল পানির সংকট। উপায়ন্তর না পেয়ে, ওয়াক্ত শেষের আগেই আমরা পানি ক্রয় করে অযু সেরে নেই। তখনই জীবনে প্রথম পানির আহমিয়ত বুঝতে পারি। যেখানে আমরা প্রতিদিন বিনাকারণে প্রচুর পানি নষ্ট করি, সেখানে সাজেকবাসী দিন কাটায় পানির অভাব নিয়ে।

সাজেকে কোনো মটর পাম্প বা পানির ফোয়ারা নেই। খাবার কিংবা ব্যবহার্য পানি তারা সরবরাহ করে নিচের সমতলভূমি থেকে। পাহাড়ি লোকজন নিচ থেকে পায়ে হেঁটে পানি নিয়ে আসে আর রিসোর্ট, কটেজে পানি আনা হয়, গাড়িতে করে ট্যাঙ্কির মাধ্যমে।

তখনও কোনো রিসোর্সে বুকিং দেইনি, আর আমাদের গাড়ির অবস্থান থেকে মসজিদ একটু দূরে, তাই একটি রিসোর্টের ম্যানেজারকে অনুরোধ করে একটু জায়গা চেয়ে সেখানেই সালাত আদায় করে নেই। সালাতান্তে গাড়ির ড্রাইভার আমাদের জানালেন, সাজেক থেকে কংলাক পাহাড় একটু দূরে। প্রায় দু'কিলোমিটারের মতো পথ। আমাদের গাড়ির বুকিং প্যাকেজে অনুযায়ী কংলাক পাহাড় যাওয়ার সুযোগ আছে একবার। কেউ বিকেলে কংলাক থেকে সূর্যাস্ত দেখে; কেউ সকালে সূর্যোদয় দেখার জন্য যায়। আমরা কখন যেতে চাই!

নতুন জায়গা দেখতে কি আর দেরি সয়? সিদ্ধান্ত নিলাম সূর্যাস্তই দেখব।

তাই সাজেকের মাটি ভালো করে পা স্পর্শ করার আগেই পুনরায় গাড়িতে চড়ে বসলাম, কংলাক যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সাজেকের মধ্যে কংলাক যেন, রাজার মাথার মুকুট। শেষ বিকেলের রোদ তাতে সোনালী প্রলেপ মেখেছে। আমরা যখন কংলাক পৌঁছাই, তখন দিবসের শেষ সময়টুকু বাকি আছে। কংলাকের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চোখ মেলতেই রবের সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য দৃশ্যমান হতে থাকে।

মাটি থেকে ১৮০০ ফুট উপরে আকাশের খুব কাছাকাছি। অনুভবে হিম বাতাস, মনে হচ্ছে আমি মেঘের দেশে ভাসছি। সবুজ বৃক্ষের অরণ্য আমার

নিচে অবস্থান করছে। কংলাকের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা সূর্যাস্ত দেখি। শত চোখ অস্ত যাওয়া সূর্যের দিকে তাকিয়ে, কারো উচ্ছ্বাস স্বপ্নপূরণের; কেউ কৃতজ্ঞ কারো প্রতি।

সূর্যাস্তের পর আমাদের প্রথম কাজ মাগরিবের সালাত আদায় করা। কংলাকে তখন অল্প কিছু রিসোর্ট ছিল। এতজন একসাথে রিসোর্টে সালাত আদায়ের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আবার অপরিচিত জায়গায় বারবার রিসোর্টে জায়গা চেয়ে নিতে লজ্জাই লাগছিল। তাই পাহাড়ে ঘাসের উপর রুমাল আর চাদর বিছিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যাই। এতক্ষণ সূর্যাস্ত দেখে বিস্মিত হওয়া শত চোখ এখন বিস্ময় নিয়ে নামাজের জামাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

রবের সৃষ্টি যত সুন্দর, ততই সুন্দর তার আনুগত্যে নিজেকে সঁপে দেওয়ার দৃশ্য। তবে আমরা রবের সৃষ্টি-সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে, তার অবাধ্যই হই খুব বেশি। ভ্রমণের ক্লান্তির অজুহাতে নামাজ ছাড়ি; অথচ আমাদের জন্য শরীয়ত কসরের ব্যবস্থা রেখেছেন। কেউ উচ্ছ্বাসে উদ্যত হয়ে যাই। পাপের উপর পাপ জমাই। নামাজ শেষে যখন চারপাশে তাকালাম, মনে হলো কিছু মুহুর্ত চারপাশ থ হয়ে ছিল। এক লোক ফিসফিস করে তার পাশের জনকে বলছিল, 'হুজুররাই ঠিক আছে, কখনো নামাজ ছাড়ে না। আমরা তো কত অজুহাত দেখাই!'

লোকটার কথা শুনেই হৃদয়ে প্রশান্তির ছোঁয়া পাই। মনে হলো ঠাণ্ডা শিহরণ দিচ্ছে কেউ। তবে এটা যে অপার্থিব স্পর্শ, তা বুঝতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে রবের শুকরিয়া আদায় করি।

মাগরিবের নামাজ শেষ করে আমরা সাজেক ফেরার চিন্তা করি। তবে কংলাক পাহাড় থেকে নামার সময় ঘটে এক মজার ঘটনা। মধ্যবয়সী এক নারী, পাহাড় থেকে নিচে নামতে গিয়ে, মাঝপথে কান্না জুড়িয়ে দেয়। তার নাকি ভয় লাগছে। ওনার স্বামী-সন্তান ওনাকে সাহস যোগাচ্ছেন, কিন্তু তিনি যেন কোনোভাবেই সাহসী হতে পারছেন না। সবশেষে কয়েকজন ওনাকে ধরে নিচে নামায়। বুঝলাম, নারী সৃষ্টিগত একটু ভীতু! নয়তো এত ছোট পাহাড় বাইতেই এত ভয়?

কংলাক থেকে ফিরে সাজেকের একটি রিসোর্টে আমরা রুম বুক করি। রাতের সাজেক দিনের সাজেক থেকে আরও সুন্দর। লাল-নীল আলোয় সাজানো কটেজ আর রিসোর্টগুলো যেন তার সমস্ত রূপ প্রকাশ করে।

রাতে পর্যটকরা নানারকম ফুর্তিতে সময় কাটায়। তার মাঝে রবের অবাধ্যার ছাপই স্পষ্ট। কেউ গিটার বাজিয়ে গান করে, কোথাও নৃত্য,

কোথাও ফানুস উড়িয়ে চলে আনন্দ-উল্লাস। আমরা রাতের প্রথমভাগে এশার সালাত আদায় করি। ইমাম সাহেব থেকে জানতে পাই, সাজেকে ইসলাম বেশ কৌটাবন্দী। এখনে মসজিদ না করে স্কুল তৈরির আন্দোলন হয়। অথচ একাধিক গির্জা তৈরি হয়েছে অনেক আগেই। ইমাম সাহেবের মুখে এসব কথা শুনে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে, আমরা ৯০% মুসলিমের দেশ বাংলাদেশে আছি।

এশার নামাজের পর আমাদের সাথীদের কেউ কেউ রুমে বিশ্রামের জন্য চলে যায়। আমরা চারজন অনেক রাত পর্যন্ত সাজেকের পুরো এলাকা ঘুরে দেখি। যত দেখি তত মুগ্ধ হই। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মাঝে আধুনিকতার আভিজাত্য! ব্যাপারটা বেশ উপভোগ্য।

শুধু পাহাড়ে হয়তো নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিকতার আভিজাত্যসহ পাহাড় এদেশে খুব কম আছে। যদিও রাতের এ হাঁটাচলার মাঝে অসংখ্য অসংগতি চোখে পড়ে। অনৈতিক কাজগুলো দেখে হৃদয়ে আফসোস বাড়ে। রবের দান এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে এসে, মানুষ কীভাবে রবের অবাধ্য হতে পারে?

নৈশভোজে আমাদের মেনুতে ছিল বসনিয়া রুটি, চিকেন বারবিকিউ। সাজেক এসেছি আর ব্যম্বু চিকেন ও ব্যম্বু টি-এর স্বাদ না নিলে কী হয়? তাই সে স্বাদ নিতেও ভুল করিনি। প্রতিটি এলাকায় ভ্রমণকালে, তাদের বিশেষত্বকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত, এতে আনন্দ বাড়ে।

সারাদিনের ক্লান্তি আমাদেরকে বেশি রাত জাগতে দেয়নি। তাই রাতের দ্বিতীয় প্রহরেই ঘুমিয়ে যাই। উঠি একেবারে ফজরের সময়। ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে দৌড়ে যাই হেলিপ্যাডে। হেলিপ্যাড থেকেই সূর্যোদয় দেখা সহজ। যদিও অনেকে কংলাকে ছুটে গেছে।

শীতের ভারী কুয়াশা। এ কুয়াশায় আরামের চাদর দূরে ঠেলে বহু মানুষ সূর্যোদয় দেখার জন্য হেলিপ্যাডে উপস্থিত হয়েছে। সাজেকের সূর্যোদয়ে তেমন বিশেষত্ব নেই। তবে বিস্ময় খুঁজে পেলাম। যাপিতজীবনে যাদের সকাল হয় দশটা-এগারোটায়, তারাও সূর্যোদয় দেখার জন্য খুব ভোরে জেগে উঠেছে।

পুরো একদিন সাজেকের সৌন্দর্য্য আর কিছু ভালো মুহূর্ত মেমোরিতে জমা করে আমরা সাজেক থেকে ফিরি। তবে এত

এত আনন্দঘন মুহূর্তগুলোর মাঝে ফেরার পথের কিছু ঘটনা ছিল খুবই ভাবনার। সাজেকের সড়কের দুপাশে অল্পসংখ্যাক উপজাতিদের বাড়িঘর দেখা মিলে। যা পুরো ষাট কিলোমিটারে ছড়ানো-ছিটানো। গাড়ির বহর যখন সাজেকের দিকে যায় বা সাজেক থেকে ফিরে, তখন উপজাতি বাচ্চারা পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে পর্যটকদের অভিবাদন জানায়। পর্যটকরাও আনন্দচিত্তে তাদের দিকে চকলেট, চিপসের প্যাকেট ছুঁড়ে দেয়। যদিও এটা অপরাধ, তবে ভালোবাসা থেকেই সবাই এমনটি করে থাকে। অন্যান্য গাড়িগুলোর সাথে আমাদের গাড়িটি ফিরছিল। আমাদের মনও চাচ্ছিল, ভালোবাসা বিলাই। কিন্তু পোশাকের ভিন্নতা দেখে-পথের পাশে দাঁড়ানো বাচ্চাগুলো আমাদের দেখেই চিৎকার করে ওঠত, 'মুসলিম, মুসলিম!' তার মানে এদের কিছু গ্রহণ করা যাবে না।

কেউ কেউ বিরূপ অঙ্গ-ভঙ্গিও করছিল। এসব দেখে আমরা ভাবছিলাম, এত ছোট বাচ্চাদের কে শেখালো মুসলিম তাদের শত্রু? কে বুঝালো, পাঞ্জাবি-টুপি পরা লোকদের থেকে সাবধান। কেউও তো তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়েছে, মুসলিমদের বিশ্বাস করো না। ওরা তোমাদের শত্রু। ওদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করো। নয়তো এত ছোট্ট বাচ্চারা কেন আমাদের দেখলে এমন বিরূপ অঙ্গ-ভঙ্গি করবে? সাজেক থেকে ফেরার পরও বিষয়গুলো নিয়ে ভাবলাম।

বাংলাদেশের কোনো এক অঞ্চলে মসজিদ তৈরি নিয়ে বিরোধিতা করা হয়, ওখানকার বাচ্চারাও পাঞ্জাবি-টুপির মুসলিম ঘৃণা করে, তবে যে আমরা ৯০% মুসলমানের দেশ লিখে দেই, সেটা কীসের শক্তিতে? ভ্রমণ শেখায়, আলো দেখায়, সাজেক আমাদেরকে প্রকৃতি দেখার পাশাপাশি, বহুকিছু শিখিয়েছে।

আলো দেখিয়েছে। এদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শিখিয়েছে। আমরা একটা ক্ষুদ্র সফরে সাজেকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়ে যেতে পারিনি। আমরা পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের ভেলায় আনন্দে ভেসে যেতে পারিনি। আমরা সবুজ অরণ্যে সুই টুই টুই করে ডাকা পাখির সাথে খুঁজেছি-এ পাখির ডাকের মতো, ইসলামের বার্তাগুলো কী পৌঁছতে পেরেছে এ পর্বতশৃঙ্গে? যদি না পৌঁছায়, তবে আমাদের করণীয় কী? সে বার্তাগুলো পাহাড়ি মানুষের কানপর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া কি আমাদের দায়িত্ব নয়?

নীল পাহাড়ের দেশে: এক টুকরো রূপকথা

আজিজুল্লাহ ফয়জ আরিব

প্রকৃতির গহিনে হারিয়ে যাওয়ার সাধ ছিল বহুদিনের। শহুরে কোলাহল থেকে মুক্তি পেতে আমরা ছুটে গেলাম সিলেটের পথে। ভোরের প্রথম আলো যখন ট্রেনের জানালায় উঁকি দিল, তখনই বুঝলাম, এক অনন্য ভ্রমণের সূচনা হতে যাচ্ছে। কুয়াশার চাদরে মোড়া সিলেট যেন আমাদের স্বাগত জানাল এক শৈল্পিক হাতছানিতে।

প্রথম প্রহর: আধ্যাত্মিক নগরীর পরশ

সকালবেলা প্রথমেই পা রাখলাম হজরত শাহজালাল (রহ.) মাজারে। সেখানে এক অপার্থিব শীতলতা, শান্তির আবেশ। মাজারের সাদামাটা সৌন্দর্য, কবুতরের গুঞ্জন আর দোয়ার সুর যেন সময়কে মুহূর্তের জন্য থামিয়ে দিল। আধ্যাত্মিক প্রশান্তি বুকে নিয়ে আমরা ছুটলাম প্রকৃতির কোলে-জাফলং।

জাফলং: পাথরের নদীতে সবুজের কবিতা

জাফলং পৌঁছাতেই চোখে পড়ল মেঘের রাজ্য ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা খাসিয়া পাহাড়। স্বচ্ছ জলে পা রাখতেই মনে হলো, প্রকৃতি নিজ হাতে এঁকেছে এক জলছবি। শীতল পানিতে পাথরের খেলা আর দূরের ঝরনার কলতান যেন আমাদের স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে গেল।

খাসিয়া পল্লির মানুষের আন্তরিক হাসি আর পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে চলা ডাউকি নদী আমাদের হৃদয়ে এক গভীর ছাপ রেখে গেল।

রাতারগুল: জলবনের রহস্যময়তা

পরদিন আমরা ছুটে গেলাম রাতারগুলের দিকে-বাংলাদেশের একমাত্র মিঠা পানির সোয়াম্প ফরেস্ট। নৌকা যখন গভীর বনের ভেতর ঢুকছিল, তখন মনে হলো আমরা এক রহস্যময় দুনিয়ায় প্রবেশ করছি। পানিতে ডুবে থাকা গাছের শিকড় আর নিস্তব্ধতার মাঝে মাঝে ভেসে আসা পাখির ডাক-সব মিলিয়ে এক অনন্য অনুভূতি। সূর্যের আলো যখন পানির উপর প্রতিফলিত হচ্ছিল, তখন রাতারগুল যেন রূপকথার এক দৃষ্টিনন্দন অধ্যায় হয়ে উঠল।

বিছনাকান্দি: পাহাড়ের কোলে স্বচ্ছতার মেলা

শেষ বিকেলে আমরা পৌঁছালাম বিছনাকান্দিতে। পাথরের বুক চিরে বয়ে চলা ঝরনা, পাহাড় আর মেঘের লুকোচুরি যেন আমাদের সত্যি সত্যিই কোনো রঙিন কল্পনার জগতে নিয়ে গেল। জলের স্বচ্ছতায় পায়ের নিচের পাথর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। শীতল পানিতে নেমে সবাই যেন শৈশবে ফিরে গেলাম। চারদিকে শুধু সবুজ, ঝরনার গর্জন আর পাখির ডাক-এ যেন প্রকৃতির এক নিখুঁত সিম্ফনি।

শেষ বিকেলের অশ্রু

ফিরতি পথে আমাদের মন ভারী হয়ে আসছিল। সিলেট যেন আপন করে নিয়েছিল, আর আমরাও তার প্রেমে পড়েছিলাম। গোধূলির লালচে আভা যখন পাহাড়ের চূড়ায় পড়ছিল, তখন মনে হলো, এই শহরের সৌন্দর্য কেবল চোখে দেখার নয়, হৃদয়ে অনুভব করার।

এই ভ্রমণ কেবল কিছু জায়গা দেখা ছিল না, ছিল প্রকৃতির সাথে এক অদৃশ্য বন্ধন তৈরি করা। সিলেটের প্রতিটি পাহাড়, নদী, বন আমাদের ভেতরের ভ্রমণপিপাসু আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছিল। আমরা ফিরলাম, কিন্তু রেখে এলাম আমাদের এক টুকরো হৃদয়, যা চিরকাল সিলেটের সবুজের মাঝে বেঁচে থাকবে। সিলেট-তুমি এক চিরসবুজ কবিতা।

বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম

আমার গ্রাম

বায়েজিদ বিন আবু বকর

যত দূর চোখ যায়, শুধু নয়নাভিরাম সবুজ কার্পেটে মোড়ানো বিস্তৃত ধানখেত ও হলুদ সরিষাখেত। সুবিশাল বালুর চরে গরু-ছাগলের হাম্বা-হাম্বা ডাক অথবা সদ্য জন্ম নেওয়া গোবৎসের ছোটাছুটি। পাখিদের কলতানে মুখরিত চারপাশ। গ্রামের বুক চিরে এঁকেবেঁকে ছুটে চলা একটি নদী-বর্ষাকালে তার ভরা যৌবনে যেকোনো বড়ো বস্তুকেও খড়কুটোর মতো অনায়াসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদীর সেই অহংকারকে বুড়ো আঙুল দেখায় জেলেদের মাছ ধরার নৌকা। বড়ো মাছ ধরে জেলেরা বাঁধভাঙা উল্লাসে মেতে ওঠে।

চৈত্র মাসের তপ্ত রোদে আবার সেই নদী শুকিয়ে রূপ নেয় মরুভূমিতে। চারপাশে ধু-ধু প্রান্তর আর চিকচিক বালি। দুপুরের তপ্ত সূর্যে হাঁটতে গেলে সেই বালুকারাশির নির্মমতা টের পাওয়া যায়। গ্রামের শেষ প্রান্তে পাহাড়, ছোটো ছোট ঝরনা, আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন। আষাঢ়ের স্নিগ্ধ প্রভাতে বাতায়ন খুললে প্রশান্তির হাওয়া হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়। টিনের চালে টুপটুপ শব্দে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে।

সমুদ্রের ন্যায় সুবিস্তৃত হাওরের তীরে শেষ বিকেলে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে। পানির বিকট গর্জন বিষাদময় বিকেলে যেন এক গুমোট পরিবেশ তৈরি করে। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ে সেই জলরাশিতে। মনে হয়, চাঁদ যেন লুটিয়ে পড়েছে আমার কোলে। যেন আকাশের সমস্ত সৌন্দর্য বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে গেছে হাওরের বুকে। চারপাশে কিছু ঝিঁঝি পোকা অবিরত চ্যাঁচিয়ে সেই পরিবেশের সৌন্দর্য বাড়ায়। হয়তো চ্যাঁচিয়ে বলতে থাকে–'তোমার কি মন খারাপ? তাহলে এই প্রকৃতিতে আসো।'

মাঘের সকালে সেই ঘাসের ডগায় টুপটুপ আওয়াজে মুক্তোর মতো কুয়াশার বিন্দুগুলো পড়ে। নীলাভ আকাশে যত দূর চোখ যায়, শুধু নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহ। পড়ন্ত বিকেলে নদীর তলায় লুকিয়ে যাওয়া সূর্যের আলোতে হাঁস-ময়ূরের খুনশুটি কিংবা নদীর বুক চিরে মাথা উঁচিয়ে চলে যাওয়া দাম্ভিক স্রোতের গর্জন। কত মিষ্টি, কত মধুর! ইট-পাথরের শহরে এগুলো পাওয়া তো বড়োই দুর্বোধ্য।

আমার প্রিয় জন্মভূমি-তোমার বাতাস গায়ে মাখতে, তোমার মাটি ছুঁয়ে দেখতে, তোমার বুকে জন্ম নেওয়া প্রকৃতির স্বাদ নিতে আমি সদা উন্মুখ হয়ে থাকি। ইট-পাথরের এই শহরে দমবন্ধ হয়ে আসা পরিবেশ, শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ আর আবেগউচ্ছলতাহীন মানুষের পৈশাচিক উল্লাসের ভিড়ে আমি তোমার কোলাহল খুঁজে বেড়াই আনমনে।

আলুটিলা গুহা: রহস্য ও সৌন্দর্যের মেলবন্ধন

বিনতে ইউনুস

দীর্ঘ জার্নি আর অনেকগুলো সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে আমরা গুহার সামনে পৌঁছলাম। বিশাল গুহা দেখে ভয় পেয়ে দূরে সরে আসলাম। মনে হলো ফিরে যাই। গুহা জিনিসটা কেমন-অনাবিষ্কৃতই থাকল না হয়। পরে আবার নিজেকে সাহস জোগালাম, আল্লাহর অপার মহিমায় সৃজিত একটা জিনিস এত কাছে এসেও না দেখে ফিরে যাব কেন?

বলছি খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত আলুটিলা গুহার কথা। গুহাটা মাথার ওপরে আস্ত পাহাড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের মাটি ছোটো-বড়ো সবুজ গাছপালায় আবৃত। চারিদিকের সবুজের মাঝে হা করে থাকা অন্ধকার গুহাটা বাইরে থেকে মনে হচ্ছে যেন রহস্যপূর্ণ।

মনে ভয়ের লেশ নিয়ে সবার সাথে পা বাড়ালাম। গুহার মুখ দিয়ে দিনের আলো ঢোকার কারণে গুমোট অন্ধকার তেমন রাজত্ব চালাতে না পারলেও ভেতরটায় একেবারে জমাট বাধা অন্ধকার। আমরা

ফোনের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে কোনোমতে পথ দেখলেও অন্ধকারেরই জয়জয়কার চলছিল। আগে না-কি মশাল নিয়ে আসা যেত, এখন মশালের ব্যবস্থা নেই। আলো-আঁধারির খেলায় যা দেখলাম, তাতে ভয় জাগানো একটা শিহরন জাগলেও আল্লাহর সৃষ্টি দেখে অবাক হচ্ছিলাম।

চারিদিকে এবড়ো থেবড়ো পাহাড়ের মাটির দেওয়াল, মাঝখানে সরু গলির মতো ফাঁকা হয়ে এগিয়ে গিয়েছে গুহাটা। হাঁটার জায়গাটাও সমতল নয়, বেশ উঁচু-নিচু। পায়ের দিক দিয়ে একটা ছোটখাটো ঝরনা বয়ে যাচ্ছিল।

কিছুদূর আসতেই দেখলাম গুহার আরেকটা শাখা বেরিয়েছে। আমাদের টিমের একজন জানালেন যে, ওটা দিয়ে বের হওয়া যায় না। এ আরেক রহস্যের দুয়ার।

সোজা এগিয়ে গেলাম আমরা। একটু পর গাঢ় অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসতে লাগল। এবড়ো থেবড়ো ভূমিতে ভীষণ সাবধানে হাঁটছিলাম, এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি গুহামুখ দেখা যাচ্ছে, এর আগে আমি জানতাম না গুহার এন্ট্রান্স আর এক্সিট পয়েন্ট থাকে দুটো। অবশেষে অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে আলোর মুখ দেখলাম, সেইসাথে সাক্ষী হলাম ভীষণ মন ভোলানো একটা দৃশ্যের।

অনেকগুলো বড়ো বড়ো গাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে গুহার দুদিকে, নুয়ে আছে গুহার ওপরের দিকে। গাছের পাতার ফাঁক গলিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে মাটিতে, আর কিছু সূর্যরশ্মি ফোনের ফ্ল্যাশ লাইটের মতো করে ফোকাস করে আছে গুহাটার মুখ বরাবর। সরাসরি না এসে গাছের পাতার প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে এই আলো আসছে বলেই হয়তো চমৎকার এক দ্যুতি ছড়াচ্ছে। গুহার উপরিভাগে নুয়ে থাকা সবুজ গাছপালা, সূর্যের সোনালি আলো-সব মিলিয়ে গুহার মুখটাকে করে তুলেছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তৈরি করেছে এক স্বর্গীয় আমেজ। এত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল একটু ভয়ে ভয়ে ওই আঁধার গুহাটা পেরিয়ে না এলে আল্লাহর সৃষ্টির এই সৌন্দর্য অদেখাই থেকে যেত।

আমার কয়েকটা শব্দ যথেষ্ট না সেদিনের, সেই জায়গার সৌন্দর্যের যথাযথ চিত্রায়ণ করতে; যথেষ্ট না আমার তখনকার মুগ্ধতার পারদ মেপে দেখাতে। সেই সৌন্দর্যের একটা ঝলক হয়তো আজীবন রয়ে যাবে আমার স্মৃতিপটে, উজ্জ্বল হয়ে।

চিকিৎসা ভ্রমণ

গৌতম সমাজদার

ভ্রমণ আমাদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এটা আমাদের হার্ট রোগের সম্পর্কিত ঝুঁকি কমায়। আমাদের স্বাস্থ্যের উপর এটি ইতিবাচক সাড়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণ এবং স্থানের পরিবর্তন মস্তিষ্ককে নতুন শক্তি প্রদান করে। আমাদের এই দৈনন্দিন দৌড়ের জীবনে ব্যস্ত সময় থেকে কিছুটা সময় বের করে অবশ্য কিছুদিনের জন্য স্থান পরিবর্তন করে ভ্রমণ করা উচিত। এটা গতির জীবনে সাময়িক বিশ্রাম এবং স্ট্রেস কমিয়ে একঘেয়ে জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। ভ্রমণে গেলে কিছু স্মৃতি তৈরি হয়, যা শরীর ও মনকে শান্ত করে, করে তরতাজা। তাই সপ্তাহের শেষ দুই দিনকে কাজে লাগান এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটান। গবেষণায় জানা যায় ভ্রমণকারীরা কম হতাশ ও বিষণ্নতায় ভোগেন। সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে হার্টের অসুখের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ বাড়ে। ভ্রমণে চাপ কমে। চাপময় জীবনে আমরা বিপদে পড়লে স্ট্রেস হরমোন তৈরি হয়। তাতে ওজন বাড়ে, ঘুম কমে যায়। ভ্রমণ স্ট্রেস হরমোন কমিয়ে সম্ভাব্য সমস্যাগুলোর সমাধানে সাহায্য করে। কাজে মনোযোগও বাড়ায়। ভ্রমণে আনন্দ

বাড়ে। ভ্রমণ হৃদযন্ত্র ভালো রাখে। রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়। চাপে থাকলে কোলেস্টেরল বাড়ে। অতিরিক্ত কাজ নিদ্রাহীনতা তৈরি করে। মানুষের সাথে দৈনন্দিন যোগাযোগ কমে যায়। সারাক্ষণ একটা ক্লান্তিবোধ কাজ করে। দেখা গেছে ভ্রমণে যাওয়ার আগে ও ফিরে এলে পর্যাপ্ত ঘুম হয়, যা শরীরকে তরতাজা করে দেয়। একটানা কাজের জীবনে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা কমে যায়, মনোযোগ বিঘ্নিত হয়, স্মৃতিশক্তিও কমে যায়।

ভ্রমণে আসে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি। মনোযোগ বাড়ায়, কাজে উৎসাহ জোগায়। অতিরিক্ত কাজের চাপে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ভ্রমণ করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। দেখা গেছে ভ্রমণে বাড়ে জীবনীশক্তি। ভ্রমণ থেকে দীর্ঘদিনের বিরতি মনের স্বাস্থ্যের জন্য একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। গবেষণায় এও জানা গেছে মানুষ যখন ছুটির পরিকল্পনা করে, তখন সবচেয়ে বেশি সুখী হয়। আমাদের ভবিষ্যৎ মনন আনন্দের উৎস হতে পারে যদি আমরা জানি যে, ভালো জিনিস আসছে। ভ্রমণ হল বিশেষভাবে ভালো জিনিস যা আমাদের প্রত্যাশা করা উচিত। ভ্রমণে নতুন পরিবেশ, দৃশ্য এবং কার্যকলাপের সংস্পর্শে আসার ফলে সেরোটোনিন এবং ডোপামিন নিঃসরণ শুরু হয়, যা নিউরো ট্রান্সমিটার, যা সুখ এবং শিথিলতার অনুভূতিতে অবদান রাখে।

গতি এবং দৃশ্যের পরিবর্তন একটি চাপ উপশমকারী হিসেবে কাজ করে। নতুন জায়গার স্বাদ উপভোগে, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে বা ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে ডুবে যাওয়া যায়, যা মনকে সতেজ করে। ভ্রমণের সাময়িক নতুন নতুন বাধাগুলো কাটাতে দক্ষতা বৃদ্ধি করে। প্রতিকূলতার মুখে আর সৃজনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। নতুন প্রকৃতি, নতুন মানুষ সামাজিক দক্ষতা বাড়ায়, সংযোগের অনুভূতি জাগায়। সুস্থতার জন্য ইতিবাচক সংযোগ তৈরি করে। ভ্রমণ মেজাজ উন্নত করে। নির্মল ভ্রমণ হোক বা কেবল সমুদ্র দর্শনই হোক তা প্রকৃতির থেরাপিউটিক প্রভাব গভীর করে। ভ্রমণের সুবিধা পেতে অবশ্যই ভ্রমণ বিমা পরিকল্পনা করতে হবে যা আর্থিক চাহিদা মেটায়, যা আমাদের পাসপোর্ট হারানো, লাগেজ হারানো, ভ্রমণে বিলম্ব, ভ্রমণের সময় ত্রাণ খরচ এবং হাসপাতালে ভর্তির খরচের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই সময় সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ুন ব্যাগপত্তর নিয়ে। নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে।

Raja Manindra Road

দেশভ্রমণের গুরুত্ব

মাসুমা সুলতানা হাসনাহেনা

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:
'বলুন, তোমরা জমিনে পরিভ্রমণ কর, তারপর দেখ, যারা মিথ্যারোপ করেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল।' (সুরা আল-আন'আম: ১১)
দেশভ্রমণ আমাদের জীবনে প্রাণের সঞ্চার করে, এনে দেয় নতুনত্বের স্পর্শ। এটি আমাদের সামনে উন্মোচন করে অজানা সৌন্দর্যের ভুবন। অপরিচিত পরিবেশে গেলে মনে জাগে বিস্ময়ের শিহরন, ভুলে যাই প্রতিদিনের তুচ্ছতা। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা যেন আমাদের আটকে রাখতে পারে না।

ভ্রমণের নেশা প্রকৃতিপ্রেমীদের টেনে নিয়ে যায় নিসর্গের অবারিত মুক্তাঙ্গনে। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা আমাদের পরিচিত গণ্ডির বাইরে নতুন জগতে পা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

কবিগুরুর ভাষায়-
'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী।
মানুষের কত কীর্তি, কত-না গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু,
রয়ে গেল অগোচরে।'

প্রতিদিন একই পরিবেশে জীবনযাপন করতে করতে আমাদের মন একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়। তখন আমাদের মন চায় নতুন কিছু অনুভব করতে, প্রকৃতির ছোঁয়া পেতে, অজানাকে জানতে। দেশভ্রমণ সেই বৈচিত্র্য এনে দিয়ে আমাদের মনে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেয়। একজন পর্যটক যখন নতুন কোনো শহরে পা রাখে, তখন তার মনে হয়- 'আহা! কী অপরূপ মহান রবের সৃষ্টি!' বিস্ময়ের চোখে সে প্রকৃতির রঙিন সৌন্দর্য অবলোকন করে। এই বিস্ময়ই তার আন্তরিক আনন্দের কারণ হয়ে ওঠে।

দেশভ্রমণ শিক্ষারও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নতুন নতুন স্থানে ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা ও রীতিনীতি সম্পর্কে জানা যায়। নিজ চোখে দেখার অভিজ্ঞতা বইয়ের পাতার চেয়েও গভীরভাবে আমাদের মনোজগতে দাগ কাটে।

পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, অরণ্য-পৃথিবীর প্রকৃতির বৈচিত্র্য আমাদের হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দেয়। বিভিন্ন দেশের মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক জীবনধারা আমাদের জানা ও বোঝার পরিধি বাড়িয়ে দেয়। ইতিহাসের অতীত কীর্তি, প্রাচীন স্থাপনা ও মহান ব্যক্তিদের জীবনচরিত আমাদের সামনে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপিত হয়।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশে ভ্রমণকে শিক্ষার অংশ হিসেবে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ এই ক্ষুদ্র জীবনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভ্রমণের গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিশেষে বলা যায়, দেশভ্রমণ শুধু বিনোদন নয়, এটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মানসিক প্রশান্তি ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ভ্রমণের বিকল্প নেই। একঘেয়েমি দূর করতে, নতুনকে জানার জন্য, জীবনের স্বাদ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে দেশভ্রমণ এক অনন্য মাধ্যম।

সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা

পাহাড়ের প্রেমে অপলক

জুনায়েদ আহমেদ

যাত্রার প্রস্তুতি:

বসন্তের প্রথম কুহুটি যখন আকাশের গায়ে অমলিন রেখা টানে, ঠিক তখনই পাঁচগাঁও পাহাড়ের ডাকে অস্থির হয়ে উঠলাম। ক্লাসের খাতায় টুকে রাখা জায়গাটির নাম-কলমাকান্দা থানার পাঁচগাঁও। পাহাড়ের নাম শুনলেই কল্পনায় ভেসে ওঠে মেঘের কোলে হেলান দেওয়া সবুজের ঢেউ। সূর্যাস্তের শেষ রক্তিম আভায় পাহাড়ি চূড়ায় দাঁড়ানোর স্বপ্ন তো ছিল বহুদিনের! কিন্তু শহুরে জীবনের কোলাহলে সে স্বপ্ন শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল। এবার যেন সময় এসেছে স্বপ্নের পাহাড়কে জাগ্রত করার।

যাত্রাপথের রোমাঞ্চ:

সকালের শিশিরভেজা রোদে বাইক নিয়ে রওনা দিলাম। সঙ্গী আসিফ-কবি হৃদয়ের মানুষ। তার চুলের ডগায় যেন বসন্তের হাওয়া লুকিয়ে থাকে। পথ চলতে চলতে মহাসড়কের একঘেয়েমি কাটিয়ে মোড় নিলাম মেহগনি বাগানের দিকে। গাছগুলো যেন আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর সবুজের মহাফেজখানা! পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ্দুরের আলপনা। মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি যেন নিজের কবিতার পাণ্ডুলিপি সাজিয়ে রেখেছে এখানে।

কিছুদূর এগোতেই চোখে পড়ল নদী। স্বচ্ছ জলে নীলাকাশের প্রতিবিম্ব ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ পানি ছুঁয়ে দেখল, আমি শুধু তাকিয়ে থাকলাম-এই নদী যেন সময়ের স্রোত, যা কখনো থামে না। এরপর এলোমেলো গ্রামীণ পথ, ধানক্ষেতের সবুজে ডুবে যাওয়া মেঠোই। হঠাৎ পথের ধারে দেখা-একটি লাল ইটের বাড়ি, উঠোনে সাদা ঘোড়া আর নিকাব পরা মেয়েটির দৌড়াদৌড়ি। মনে হলো, ছবির ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসেছে গ্রামবাংলার সরল সুখ।

পাহাড়ের প্রথম দর্শন:

কলমাকান্দা শহর পেরিয়ে যখন পাঁচগাঁওয়ের পথে বাইক ছুটল, তখন

থেকেই শুরু হল রোমাঞ্চ। বাঁশবনের ঘন অন্ধকার পথ পেরিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল দিগন্তজোড়া পাহাড়ের সারি। সবাই চিৎকার করে উঠলাম-'পাহাড়! পাহাড়!' ভারতীয় সীমান্তের পাহাড়গুলো যেন সবুজ চাদরে মোড়া দৈত্যাকার প্রহরী। মেঘেরা তাদের মাথায় হেলান দিয়ে খেলা করছে। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছাতেই মনে হলো, প্রকৃতি যেন আমাকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এলো।

চূড়ায় আরোহণ:

খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে পা কাঁপছিল, কিন্তু মন ছিল উদ্বেল। সবুজের গহিনে লুকানো পাথুরে পথ, বুনো ফুলের গন্ধ, পাখির কলতান-সব মিলিয়ে যেন এক প্রাণবন্ত কবিতা। চূড়ায় পৌঁছে যখন নিচের পৃথিবীটা দেখলাম, মনে হলো যেন আকাশের পালঙ্কে বসে সৃষ্টিসৌন্দর্য গুনছি। দূরে ধানক্ষেতের সবুজ, গ্রামের ঘরবাড়ি, নদীর রুপালি রেখা-সবই যেন জলরঙের ক্যানভাস।

ঝরনার জলকেলি:

নেমে এলাম পাহাড়ের পাদদেশে। সেখানে অপেক্ষা করছিল এক ক্ষীণ ঝরনা। স্বচ্ছ জলের ধারায় মুখ-হাত ধোয়ার সময় মনে হচ্ছিল, এই জল যেন পাহাড়ের অশ্রু-সব ক্লান্তি ধুয়ে নিয়ে যায়। ঝরনার পাশে বসে সূর্যাস্ত দেখার মুহূর্তটাই ছিল যেন স্বর্গীয়। আকাশ লাল হয়ে উঠছিল, পাহাড়ের চূড়ায় শেষ সূর্যের কিরণ যেন সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলো।

ফেরার পথে:

ফিরতে ফিরতে বারবার পেছনে তাকালাম পাহাড়ের দিকে। মনে হচ্ছিল, পাহাড় যেন হাত নেড়ে বলে চলেছে-'আবার এসো...' আসিফ কবিতার লাইন কাটছিল, আমি মুখে মুখে গুনছিলাম এই ভ্রমণের মুহূর্তগুলো। বাইকের হুইলে হাত রেখে ভাবলাম-পৃথিবী এত সুন্দর, আর আমরা কত ছোট!

পরিশেষে:

যে পাহাড়কে কল্পনায় এঁকেছিলাম, তার চেয়েও সে ছিল অধিক রহস্যময়, অধিক মায়াময়। ফেরার পথে মনে হচ্ছিল, পাহাড়ের প্রতি এই ভালোবাসা যেন এক অদৃশ্য সুতো-যা বেঁধে রেখেছে আমার হৃদয়কে তার সবুজ আস্তরণে। হয়তো একদিন আবার ফিরব এই পাহাড়ের কোলে, প্রকৃতির অকৃপণ আলিঙ্গনে ডুব দিতে। কারণ, প্রতিটি ভ্রমণই তো জীবনের পাতায় লেখা এক অমর কবিতা। "পাহাড় চিরদিন ডাকে না, ডাকে তার নীরব ভাষা-যে ভাষা বোঝে only the wild at heart..."

মহামায়া লেক: মিরসরাইয়ের নীল ফানুস

খাদিজা আক্তার

অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা আমাদের এই দেশ বাংলাদেশ। সবুজ শ্যামল প্রকৃতি নিয়ে নিদারুণভাবে মুগ্ধ করে প্রকৃতি। আর সেই প্রকৃতির সান্নিধ্যে ঘুরে বেড়াতে কে না চায়!

প্রকৃতির সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটাতে পারলে যেনো অসুস্থ মস্তিষ্কও সুস্থ্য হয়ে যায়। তাই ঘুরতে যাওয়ার সাথে আত্মার এক অন্যরকম প্রশান্তি অনুভব করা যায়। ঘুরতে যাওয়া বর্তমান সময়ের একটি ট্রেড, ফেশন এবং স্টাইল। ঘুরতে যাওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে মানুষের কিছু আনন্দঘন মুহুর্ত। সকলের কাছেই ঘুরাঘুরি একটি অন্যতম ভালো লাগা ও অনুভূতির জায়গা। আর সেই ভালো লাগা, অণুভূতির জায়গা থেকে আমি আমার জীবনের একটি আনন্দ ভ্রমনের মুহুর্তগুলো তুলে ধরলাম। সেই আনন্দ ভ্রমণটি ছিলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা "মহামায়া লেকে"। ২০১৯ সালের শুরুর দিকে মার্চ মাসে হয় এই আনন্দ ভ্রমণ।

যদিও এটি ছিলো একটি শিক্ষা সফর, তবে আমার কাছে এটি একটি আনন্দ ভ্রমণ।

মহামায়া লেক এর অবস্থান এবং আমার ঘুরাঘুরি:

"মহামায়া লেক (Mohamaya Lake) চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ একটি কৃত্রিম হ্রদ। ১১ বর্গ কিলোমিটারের এই লেকের অবস্থান মিরসরাইয়ের ঠাকুরদীঘি ইউনিয়নে। বিস্তীর্ণ লেকের মধ্যে ডুবে আছে অনেকগুলো পাহাড়, আছে ঝর্ণা। টলটলে পানি আর সবুজ প্রকৃতির মাঝে নৌকা নিয়ে এসব পাহাড়ের বাঁকে ঘুরে বেড়ানো যায়।

স্মরণীয়, অসাধারণ, প্রাণবন্ত, শিক্ষনীয় এই ভ্রমণ ছিলো আমার কাছে প্রকৃতির এক নিদারুন ভালোলাগা, ছিলো অনেক আনন্দঘন মুহুর্ত। উচু উচু পাহাড়, লম্বা সরু গাছের বন, লেকের পাশের ঝর্ণা এখনো চোখে ভাসে। জার্নিটা ছিলো বাসে, সঙ্গি ছিলো আমার বাবা। বাবার সাথেই কেটেছে সেই মুহুর্তগুলো। পুরো বাস জুড়ে শিক্ষার্থীদের মুখরিত নাশিদের সাথে সুর মিলানো ছিলো এক অসাধারণ ভালো লাগা, যেখানে অন্য কোনো ভ্রমণে পুরো যাত্রাই থাকে মিউজিক কিংবা গান বাজনার সাথে।

সেই দিনটির সাক্ষী ছিলো সমুদ্রের গর্জন, মেঘ-কুয়াশার আলতো স্পর্শের পরম অনুভূতি, আনন্দ, ইচ্ছা, প্রত্যাশা, উৎফুল্লতা, উচ্ছাস আর উত্তেজনার উষ্ণ প্রতিফলন। আসলে ঘুরতে গেলেই কেমন যেন সবকিছু রঙিন লাগে, সবকিছুই ভালো লাগে! ভ্রমনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা সময় থাকে আনন্দে জর্জরিত । তবে ফেরার পথটা থাকে বেদনাদায়ক, যেন কিছু রেখে এসেছি, ফেলে এসেছি হাজারো খুশি অনুভূতি, ফেলে এসেছি প্রকৃতির নিদারুণ সৌন্দর্যের মোহনীয়তা। সেই সঙ্গে আকাঁবাকাঁ পাকা রাস্তায় চলতে চলতে ছোটবড় পাহাড় ও এর অপরূপ সৌন্দর্যে উপভোগের সেই অনুভূতিগুলো কীভাবে বর্ণনা করবো?

সব মিলিয়ে "মহামায়া লেক" এর সেই ভ্রমণটি ছিলো আমার জীবনের একটি আনন্দ ভ্রমণ।

চান্দিনা, কুমিল্লা

জোহান ড্রিম পার্ক:
ঝিনাইদহের স্বপ্নের বিনোদন রাজ্য

সাঈদুর রহমান লিটন

জোহান ড্রিম পার্ক, ঝিনাইদহ জেলার এক জনপ্রিয় পর্যটন স্থান, যা প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য একটি স্বপ্নের জায়গা। কনকনে শীতের মধ্যে যখন আমরা সেখানে পৌঁছালাম, তখন চারপাশের সুন্দর পরিবেশ যেন এক মধুর অনুভূতি সঞ্চারিত করছিল। আমি এবং আমার পরিবার-স্ত্রী মনোয়ারা বেগম, ছোট সন্তান অনন রহমান বাপ্পি, ভাস্তে কাকন এবং ছোট ভাস্তি মুসলিমা-এখানে এসে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। বড় ছেলে অনিক রহমান বাঁধন যেতে পারেনি চাকুরির সুবাদে।

আমরা একটি স্কুল ট্যুরে অংশ নিয়েছিলাম, যেখানে প্রায় দুইশ ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পার্কটি ছিল একদম সবুজে ভরা, শান্তিপূর্ণ এবং মনোরম। আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল ফুলের বাগান, যেখানে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রজাতির ফুল ফুটে ছিল। বাগানের প্রতিটি কোণে ছিল এমন এমন ফুল, যা দেখতে মনে হচ্ছিল যেন

প্রকৃতি তাদের সমস্ত সৌন্দর্য এখানে নিংড়ে দিয়েছে। আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলে এবং ছবি তুলে সেখানে বেশ কিছু সময় কাটালাম।

এরপর আমরা পার্কের অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থানগুলো দেখতে গেলাম। নাগর দোলায় চড়ে, যেন আকাশে ভেসে যাওয়ার অনুভূতি হয়েছিল। দোলায় চড়ে আমাদের সবার হাসি-খুশি আর আনন্দ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সারা দুনিয়া আমাদেরই। স্পীট বোট ভ্রমণেও অনেক মজা পেয়েছিলাম। সুরেলা বাতাসের মধ্যে ভেসে যাওয়ার মতো মজা আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের সবার মধ্যে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। নৌকায় দোলানোর সময় প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ আমাদের কাছে এক অপরূপ দৃশ্য ছিল। সেখানে থাকা সবুজ গাছপালা এবং জলাশয়ের শান্ত পরিবেশ আমাদের মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দিয়েছিল।

যাদু শোটি আমাদের জন্য ছিল আরও একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কিছু দক্ষ শিল্পী আমাদের সামনে চমকপ্রদ কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করছিলেন। তাদের যাদুতে আমরা সকলেই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিটি শো ছিল কৌতূহল এবং বিস্ময়ে পূর্ণ। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে তাদের কাজ দেখছিল এবং আমরা শিক্ষকরা তাঁদের প্রতি শিহরিত হচ্ছিলাম।

পার্কের সৌন্দর্য এবং এখানে আসা অন্য পর্যটকদের পরিবেশ থেকে আমরা সবার সঙ্গে আনন্দে ভরপুর কিছু মুহূর্ত কাটালাম। সবার হাতে ছিল ফোন এবং ক্যামেরা, যেন একে অপরের সঙ্গে ছবি তোলার মাধ্যমে এই সুন্দর মুহূর্তগুলো সঞ্চয় করতে পারে। আমার পরিবারও বেশ কিছু ছবি তুলেছিল, যা পরবর্তী সময়ে স্মৃতির পাতায় অমর হয়ে থাকবে।

এছাড়াও, আমাদের খাবারের অভিজ্ঞতাও ছিল অসাধারণ। আমরা সকালের খাবার খিচুরি এবং ডিম রান্না করে নিয়ে গিয়েছিলাম। পথে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে খেয়ে নিলাম। এটি ছিল এক ধরনের মজাদার অভিজ্ঞতা, কারণ সকালের ঠান্ডায় খিচুরি ও ডিম খাওয়ার অনুভূতি ছিল একেবারে আলাদা। এরপর, দুপুরে আমরা সবাই একসঙ্গে খাওয়া শুরু করলাম। খাবারের স্বাদ ছিল অতুলনীয়, এবং সবাই একে অপরকে খেতে দেখে আনন্দিত হচ্ছিল।

পার্কের পরিসর ছিল এতটাই বিস্তৃত যে আমরা হেঁটে হেঁটে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছি। পরিবেশ এতটা শান্ত এবং সুন্দর ছিল যে, সেখানে হাঁটতে হাঁটতে

আমাদের মনপ্রাণ পুরোপুরি প্রশান্ত হয়ে উঠেছিল। বিশেষত শিশুদের খুশি দেখে আমাদের মনে এক শান্তির অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছিল। তারা পার্কের বিভিন্ন স্থানে খেলা করছিল, নাগর দোলায় চড়ে আনন্দ নিচ্ছিল এবং যাদু শোতে মুগ্ধ হচ্ছিল।

সবশেষে, জোহান ড্রিম পার্কের এক অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের স্কুল ট্যুরের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে আসার মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করেছি, নানা রকমের আকর্ষণীয় শো এবং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছি, এবং খাবারের দিক থেকেও এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ফিরে আসার পথে, আমরা সকলেই অনেক তৃপ্তি এবং আনন্দের সঙ্গে ঘরে ফিরেছিলাম। মনে হচ্ছিল, এরকম জায়গায় আবার কখনো আসলে ভালো লাগবে, কারণ এখানে যে শান্তি এবং আনন্দ পাওয়া যায়, তা খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়।

সবমিলিয়ে জোহান ড্রিম পার্ক আমাদের ভ্রমণকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। এটি শুধু একটি পর্যটন স্থান নয়, বরং একটি জায়গা যেখানে প্রকৃতির মধ্যে শিথিলতা এবং আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। ভবিষ্যতেও এখানে ফেরার ইচ্ছা আমাদের সবার মধ্যে অটুট থাকবে।

মধুখালী, ফরিদপুর

সাফারি পার্ক: বন্য প্রকৃতির রাজ্যে একদিন

মাজহারুল ইসলাম আবির

মসজিদ থেকে বের হয়ে সামনে এগুতেই দেখি ইউসুফ মাদানী উস্তাজি দাঁড়িয়ে আছেন নিম গাছটির নিচে। তাঁর চোখে ছাত্রদের পর্যবেক্ষণের ছাপ স্পষ্ট। আমি হাত বাড়িয়ে সালাম দিলাম। সালামের উত্তর দিয়ে তিনি আমার প্রতি আর ভ্রুক্ষেপই করলেন না! আমি ভেবেছিলাম, উস্তাজি সফর বিষয়ে আমাকে কিছু নাসিহাহ করবেন। সেই আশাতেই দেখা করা। আমি দাঁড়িয়েই আছি দেখে,উস্তাজি কিছুটা অবাক ভঙ্গিতে বললেন, কে তুমি! আমি মনে মনে ভাবলাম, উস্তাজি কি তাহলে আমাকে চিনতে পারেননি!? উস্তাজি আবার বললেন, ওমন মুখ ঢেকে আছো কেন? তোমাকে তো চেনা যায় না। কী গেটাপ! আমি বুঝলাম, উস্তাজি আমাকে চিনেও না চেনার ভান করে আমাকে কোনো একটা আদব শিক্ষা দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি মাস্কটা খুলে ফেললাম। সহসা সেখানে এসে দাঁড়ালেন নজরুল ইসলাম সালাফী উস্তাজি। আমি হাত বাড়িয়ে সালাম দিলাম। এই মানুষটায় একটু আগে মুসাফিরদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বললেন মসজিদে। ইউসুফ মাদানী উস্তাজি গেটের দিকে ইশারা করে আমাকে বললেন, তুমি সফরে যাবা না! যাও! আমি গেটের দিকে তাকালাম, দেখি কেউ নেই। সবাই হাঁটা ধরেছে ভুগরইল মোড়ে। সেখানেই বাস আসবে

আর কাঙ্ক্ষিত সফর শুরু হবে। আমি দৌড়ে গেলাম বাইরে। সামনে দাঁড়ানো একটা অটো থেকে এক ছোটভাই আমাকে ডেকে বলল, এইখানে উঠেন। আমি ওঠে পড়লাম। অটো চলতে লাগল।

ভুগরইলে দাঁড়িয়ে সবায়। সবায় অপেক্ষমান বাসের। রাস্তা দিয়ে কোনো বড় গাড়ির লাইট চোখে লাগলেই সকলে বলে উঠছে, ওই তো বাস! কিন্তু তা কখনো ট্রাক,মাইক্রো,বা অন্য কোনো বাস। এরকম চলতে চলতে একটা বাস এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। সবাই সামনে গিয়ে ভিড় জমালাম। প্রত্যেকে চায় আগে বাসে উঠবে। কিন্তু তা তো আর হয়না। তাই নাসির ভাই দাঁড়িয়ে গেলেন বাসের দরজায়। দরজার গোড়ায় কারামী উস্তাজি। এক নাম্বার বাসের পূর্বনির্ধারিত ছাত্রদের নাম ঘোষণা হতে লাগলো এক এক করে। আমি আগে থেকেই জানি- এই বাসে আমি না। আমি দ্বিতীয়টাতে। এমনটাই হওয়ার কথা। কারণ, আমি নাম লিখিয়েছিই সবার শেষে! আমাকে যে নিয়েছে এটাই অনেক!

এতক্ষণে দ্বিতীয় বাসটাও এসে পড়েছে। সবার নাম ডাকছে অথচ আমার নাম ডাকছেই না। আশপাশ খালি হয়ে গেল। আমি এগিয়ে এবার উঠতে গেলাম। এমন সময় আমার নাম ডাকা হলো।

সবায় নিজ নিজ পছন্দানুযায়ী সিটে বসেছে। বাসের ঠিক মাঝ বরাবর একটা সিট ফাঁকা। ওটা আমার। অবশ্য ওটা আমি পেতাম না, যদি না আমি প্রথমে বাসে উঠা ভাইটাকে বলতাম,"আমার জন্য জানালার ধারে একটা সিট ধরে রাখিয়েন।"আমার বাসে থাকতে প্রবলেম হয়। জানালার পাশে একটু কম হয়। শীতল বাতাসের ছোঁয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যও ছিল বটে।

ভুগরইল থেকে আমাদের বাসটা ছাড়ল রাত ১১:৩৫ এ। এর মিনিট দুয়েক আগে ছেড়েছে প্রথম বাসটি। বাস দুটি ছাড়ার আগে দু বাসেই নাসিহা দিলেন কারামি উস্তাজি।

সাফারি পার্কে পৌঁছি সুবহে সাদিকের সময়। বাস থেকে নেমে সামনে একটি মসজিদ-"সাফারি পার্ক জামে মসজিদ"। ওযু করে মসজিদে ঢুকলাম। ফজরের জামাআত শুরু হলো ৬:০০ টায়। সালাত শেষে সকলে বাসের কাছে আসলাম। সেখানে ছাত্রদের গ্রুপ করে দেয়া হলো। এরপর ৬: ৪০ এ ব্রেকফাস্টে দেয়া হলো রুটি, কলা ও সিদ্ধ ডিম। পার্কের গেট খোলা হবে ৯টায়। এখন বাজে ৭টা। আমরা

ব্রেকফাস্ট শেষে মসজিদটিতে গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে নিজেদের মতো সাজলাম। তারপর যার যার মতো পার্কের বাহিরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

সামনে একটা ঘোড়া দেখলাম। ঘোড়ার পিঠে উঠে টগবগিয়ে মাঠে একটা চক্কর দিলাম। ঘোড়াতে উঠার অনুভূতি ছিল অসাধারণ। মনে হচ্ছিল, আমি বীরপুরুষ! রবীন্দ্রনাথের লেখা সেই "বীরপুরুষ " এর বীরপুরুষ।

গেট খোলা হলো সকাল ৯টায়। সকলে সারিবদ্ধ হয়ে ভিতরে ঢুকলাম। প্রথমেই চলে গেলাম সাফারি পার্কের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গাটিতে-"বাসে করে পশু দেখা"। প্রথমে গিয়ে অনেক ভালো করেছি। নইলে পরে হয়তো সুযোগই হতো না-যে ভীড় আর লম্বা লাইন ছিল! পুরো জায়গাটা জঙ্গলের মতো। সেখানে দেখলাম- একদল জিরাফ তাদের লম্বা গলা উঁচু করে গাছের পাতা খাচ্ছে। আরো দেখলাম লম্বা শিংওয়ালা সোনারঙা হরিণ, চিত্রা হরিণসহ নানান প্রজাতির হরিণ। হরিণের আঁখিগুলো আমার আঁখিদ্বয়কে বশ করে নিয়েছিল। বুঝতে পারলাম, সৌন্দর্য বোঝাতে কবি, সাহিত্যিকরা কেন হরিণের চোখের উপমা দিয়ে থাকেন। দেখলাম বোয়াল গরু, আফ্রিকান গরু, নীল গাই। শিয়াল পন্ডিতের লেজ নাড়িয়ে দৌড়াদৌড়ি, একটা বানর গাছের ডালে তীর্যক চোখে তাকিয়ে আছে। আরেকটা বানর তাধিন তাধিন এ গাছ থেকে ও গাছ নেচে বেড়াচ্ছে। একদল জেব্রা একটা কুয়োর চারিপাশে ভিড় করে রয়েছে। দুইটা ভাল্লুক আমাদের বাসের কাছাকাছে এসেছিল। এরপর যখন আমরা সিংহের ডেরায় প্রবেশ করলাম, তখন এক ভয়ার্ত শিহরণ অনুভব করছিলাম। আমাদের অদূরের একটা ঢিবিতে বসে আরাম করছে সিংহ। এদিক ওদিক ঘাড় নাড়াচ্ছে। আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলাম, সিংহটা আমাদের বাসের জানালায় এসে থাবা মারছে আর আমরা ভয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যাচ্ছি। যদি এমন হতো,তাহলে হেব্বি হতো! শেষে আমরা ঢুকলাম বাঘের আস্তানায়। বাঘের দেখা মিলল একদম শেষ প্রান্তে। দেয়ালের গাঁ ঘেঁসে রাজার মতো পা ফেলে ফেলে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাঁটছে। আমরা হালুম হালুম বলে ডাকতে লাগলাম।!!!

চক্ষুগোচরের দৃষ্টিনন্দিত জিনিসগুলো দেখছি আর হাঁটছি। সামনে একটা কাউন্টার। কাউন্টারের চারপাশে প্রজাপতির ছবিতে ভরপর! আমার

যারপরনাই ভালো লাগার জিনিস হচ্ছে প্রজাপতি। সেখান থেকে টিকিট ক্রয় করলাম। এই টিকিটে শুধু প্রজাপতি নয়, দেখা যাবে "Colour Carp Fish" ও"Nature History Museum"। প্রথমেই ঢুকলাম "Butterfly Garden"। সেখানে ঢুকতেই একটি ঝর্ণা। দেয়ালের উপর থেকে গা বেয়ে পাথরের উপরে পানি পড়ছে আর অতি সুন্দর একটি আওয়াজ হচ্ছে। আমার ভীষণ ভালো লাগলো। যা আমি লিখে প্রকাশ করতে পারব না। পুরো জায়গাটি সবুজে ঘেরা। সেখানের গাছগুলো আমার প্রথম দেখা এবং নামও অজানা। কিছুটা লতাপাতার মতো। গাছগুলো জায়গাটিতে এমনভাবে ছাউনি হয়ে ছিল যে, মনে হচ্ছিল নীল আসমানের নিচে এ এক সবুজ আসমান। সেখানে ছোট্ট একটি পুকুরের উপর ছিল ছোট্ট একটি সাঁকো। এখানে সেখানে ছিল নানান ফুলের বাহার! ফুলের উপর দিয়ে প্রজাপতিরা রঙিন পাখা ছড়িয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। যেদিক তাকাই সেদিকই প্রজাপতি! ভিন্ন ভিন্ন রঙের! কী যে সুন্দর লাগছিল! আমি কালো রঙের ফোঁটা ফোঁটা সাদা পাখার একটি প্রজাপতিকে ছুঁয়ে দেখতে তার পিঁছু নিলাম। কিন্তু সে আমার ইচ্ছেকে বুঝলো না। অধরায় রয়ে গেল!

এরপর আমরা গেলাম " Colour Carp Fish"দেখতে। এখানে প্রবেশের আগে আমরা দশ টাকার মাছের খাদ্য কিনলাম। কাঠের একটা ব্রীজের উপরে হাঁটছি আমরা। হাত থেকে আস্তে আস্তে খাদ্য পানিতে ফেলতেই দেখতে পেলাম বে-হিসেব রঙের অগণিত মাছ। যেগুলো এখানে আনা হয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে। আমরা কালারিং মাছগুলোর ইটিং উপভোগ করছিলাম।

এখান থেকে বের হয়ে একটু আগাতেই কুমিরের দেখা মিলল। প্রথমে মনে হলো, এরা হয়তে মূর্তি। নড়ছেনা কিছুনা! কিন্তু একি! একটা কুমির পা ফেলে হেঁটে হেঁটে পুকুরের মাঝে গিয়ে ডুব দিল! আরেকটা কুমিরের দাঁতে রক্ত লেগে আছে। পাশ থেকে কে যেন বলল, একটু আগে এই বেটা একটা মুরগি কুবিয়েছে!

এবার আমাদের দেখার পালা "Nature History Museum" আমরা সেটা খুঁজছি। কিন্তু পাচ্ছিনা। সিদ্ধান্ত নিলাম, এখন বরং " Nine D Movie" দেখতে যাই। এখানে নাকি চশমা চোখে দিলেই অন্য এক বাস্তব দুনিয়াই যাওয়া যায়! আমি ভয়ে ভয়ে চশমা চোখে দিয়ে চেয়ারে বসলাম। এখন যাব এডভেঞ্চারে। শুরু হলো

এডভেঞ্চার !আমাদের চেয়ারগুলো কেঁপে উঠল। মনে হলো,আমি সত্যিই ওই দুনিয়ায় ঢুকে পড়েছি।আমরা যেন বসে আছি একটা বগিতে। বগিটা থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে! (আসলে আমাদের চেয়ার কাঁপছিল)। যেটা চলছে রেললাইনে। কখনো আকাশে, কখনো পাহাড়ে, কখনো বা গুহায়! পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছি জমিনে, আবার উড়ে উঠছি আকাশের রেললাইনে! সামনে যা আসছে সব ভেঙেচুরে চলে যাচ্ছি। কোনো বাধাই ঠেকাতে পারছেনা আমাদের।

"Nine D" থেকে বের হয়ে একটু আগাতেই পাখির কলকাকলি আর মধুর গান শুনতে পেলাম। এখানে পাখির জগত। পাখির কূজনে আশপাশ বিমোহিত হয়ে রয়েছে! সময় স্বল্পতার কারণে এখানে আর ঢুকলাম না।

এখন এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে আছি। চোখের সীমানায় হরেক প্রজাতি আর ফুলের সমাহার! আমার অসম্ভব ভালোবাসার একটি জিনিস ফুল। কত সুন্দর সৃষ্টি রবের! অসাধারণ! ফুলের পাতা, কান্ড, শাখা সব অসাধারণ!

আমরা হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগুতে থাকলাম। এবার খুঁজে পেলাম "Nature History Museum" ভিতরে প্রবেশের সময় জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কী দেখতে পাবো? ওরা বলল, সমুদ্রের তলদেশের আজব সব প্রাণী ও ১২ প্রজাতির হাঙ্গর ও ডলফিন। আরো রয়েছে সাপ, অক্টোপাস, চিতাবাঘ এবং অসংখ্য প্রাণী ও তাদের ডিম! এখানকার সবচে ইন্টারেস্টিং বেপার হচ্ছে, এখানের সব কিছু মরা!

সাফারি পার্কের সবচেয়ে আকর্ষনীয় স্পট ছিল এই মিউজিয়াম আর গাড়িতে চড়ে কোর সাফারী পার্ক ভ্রমণ!

ছাত্র : আল-জামিআহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী।

‘ক্যাম্পাস টু জাফলং’

হাফিজ মাছুম আহমদ

সিলেট বিভাগের সেরা কলেজ হলো মুরারিচাঁদ কলেজ। যাকে সংক্ষেপে এমসি কলেজ বলা হয়। এই কলেজে বিভিন্ন সংগঠন ও অনেক দল রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো ‘কওমি স্টুডেন্ট ফোরাম’। কওমি স্টুডেন্ট ফোরামকে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার মন থেকে ভালোবাসেন বলেই কলেজ অডিটোরিয়ামে ‘কওমি স্টুডেন্ট ফোরাম’র ব্যানারে সীরাত মাহফিলের অনুমতিসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমরা আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে নিয়ে গর্ব করি। কারণ আমরা দেখেছি বুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠানে সীরাত মাহফিলের অনুমোদন দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ‘কওমি স্টুডেন্ট ফোরাম’ কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষা সফরে কলেজের বড় বাসটিও দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা প্রিয় স্যারকে দুনিয়া এবং আখেরাতের ভরপুর সফলতা দান করুন।

দিনটি ছিলো '২৪ সালের শেষ শুক্রবার। ‘কওমি স্টুডেন্ট ফোরাম’ থেকে আমরা কলেজ টু জাফলং শিক্ষা সফরের জন্য বের হই। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শিক্ষা সফরের

ইভেন্টসমূহ শুরু হয়। প্রথমে তেলাওয়াত করেন হাফিজ হুসাইন আল আমীন, এরপরে তেলাওয়াত করি আমি। পরে ইসলামী সংগীত পরিবেশন হয়। বাসের মধ্যেই 'ভাগ্য খেলা'র পর্ব সম্পন্ন হয়। পথিমধ্যে আমাদের শিডিউল অনুযায়ী সিলেটের হরিপুরের বিখ্যাত খিচুড়ি দিয়ে সকালের নাস্তা করি। অতঃপর হরিপুরের বিখ্যাত প্রয়াত আলেম আল্লামা হরিপুরি রাহিমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হরিপুর মাদরাসা পরিদর্শন ও হরিপুরি রাহিমাহুল্লাহ'র মাকবারা যিয়ারত করি।

বাস তার নিজস্ব গতিতে চলতে লাগলো। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর বিভিন্ন বিনোদন উপভোগ করতে করতে আমরা জাফলং এসে পৌঁছি। জাফলং পৌঁছে যে যার মতো ঘুরে জুমুআর নামাজ পড়ে সবাই একত্রিত হওয়ার নির্দেশনা আসে। আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আমি আর আমিন হাসান কাঁধে কাঁধ রেখে জাফলংয়ের মেইন স্পটের জন্য হাঁটা শুরু করি। আমাদের সাথে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য ভাইয়েরাও অংশগ্রহণ করে। ইচ্ছেমতো ঘুরাঘুরির পর আমরা বেশ ক'জন মিলে কিছুক্ষণের জন্য একটা নৌকা ভাড়া করি। নৌকার মধ্যে আমাদের অনেক প্রতিভাবান ভাই ছিলেন। ইন্ডিয়াকে সামনে রেখে বিদ্রোহী সংগীতসহ অনেক বিনোদন উপহার দিয়েছেন তারা।

নামাজের সময় হলে জাফলংয়ের নিকটবর্তী একটা মসজিদে যাই। নামাজ শেষে ভীড়ের কারণে মসজিদের ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম। উপর থেকে মনে হচ্ছিলো ঢাকার সায়দাবাদ না হয় মহাখালীর বাসটার্মিনাল। ঐ সময়টাও অত্যন্ত উপভোগ্য ছিলো। সত্যি বলতে আমিন হাসানের সাথে কাটানো আমার প্রতিটা মুহূর্তই উপভোগ্য। প্রত্যেক মানুষের জীবনে বলার মতো কিছু স্মৃতি থাকে, আমার বেশিরভাগ স্মৃতিই ওরে নিয়ে। অতঃপর আমরা গ্রামীন পরিবেশের একটা রেস্টুরেন্টে যাই দুপুরের খাবার খেতে। খাবার শেষে আমি আর আমিন হাসান বিশেষ এক উদ্দেশ্যে আবার যাই দোকানপাটে। সবশেষে সিলেট পানে বাস যাত্রা শুরু করি। পথিমধ্যে আসরের নামজের সময় হলে রাস্তার পাশে একটা মসজিদে আমরা সালাতুল আসর আদায় করি।

নামাজ শেষে কিছুক্ষণ বাস চলার পর পথিমধ্যে একটা স্কুল মাঠের পাশে বাস থামে। ঐ মাঠে আমরা আমাদের বাকী ইভেন্টগুলো সম্পন্ন করি। বেলুন ফাটানো, হাঁড়িভাঙ্গা ও দৌড় প্রতিযোগিতা হয় সেখানে। সারাদিনের ক্লান্তি নিয়েও সব ইভেন্টে অংশগ্রহণ করি। আল্লাহর রহমতে দৌড় প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট পুরস্কার আমি

পাই। এরই মধ্যে মাগরিবের আযান হয়ে যায়। নিকটবর্তী একটা মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করে আমি আর আমিন হাসান দোকান থেকে প্লাস্টিকের চায়ের কাপে চা নিয়ে বাসে উঠি। আমিন হাসানের সাথে পুরোদিনের অনুভূতি বলতে বলতে কখন যে, বাস কলেজ গেইটে পৌঁছে বুঝতেই পারিনি। বাস ক্যাম্পাসে প্রবেশের পর সবাই সবার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

২৪'সালের শেষ শুক্রবারটি 'কওমি স্টুডেন্ট ফোরাম এমসি কলেজ'র কল্যাণে অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে কাটে। উক্ত ফোরামের দায়িত্বশীল সিনিয়র ভাইদের কৃতজ্ঞতা না জানালে নিমকহারামি হবে; যাদের প্রচেষ্টায় আমরা এরকম উপভোগ্য একটা শিক্ষা সফর উপহার পেয়েছি। আপনাদের জন্য শ্রদ্ধা ভালোবাসা আর দুআ রইলো। আশা রাখি আগামীতে আপনাদের মাধ্যমে আরো ভালো এবং সুন্দর অনেক কিছু পাবো। জাযাকুমুল্লাহ।

শিক্ষার্থী, বি.এ ২০২১-২২ সেশন, এমসি কলেজ সিলেট।
শিক্ষক, জামেয়া ইসলামিয়া দারুল হাদিস জাউয়া।

ওয়েলিংটন ও অকল্যান্ডে কয়েকদিন

বি এম মিজানুর রহমান

সময়টা কাটছে স্বপ্নের মতো। বরাবরই শীত ঋতু প্রিয় আমার নিউজিল্যান্ডের মতো দ্বীপের রাষ্ট্রে এসে খুব ভালো লাগছে। শীতেল হাওয়ায় আমাদের মতো বিদেশিদের পোষাক দেখে স্থানীয়রা হয়তো অবাক হচ্ছিল। কেননা তাদের ছোট্ট স্থানীয় পোষাক পরিহিত দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেখানে গরম পড়েছে। তবে নিউজিল্যান্ডের মাওরি আদিবাসী অবাক না হলেও তাদের সাথে থাকা লম্বা লোমশ ডগিরা নিশ্চয়ই অবাকই হয়েছেন নইলে অমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে কেন?

হোটেল রোজ ভ্যালিতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। হোটেল রুমের ভেতরকার আকৃতি যেন পাখির বাসার মতো। দুইটা বেড এবং ব্যবহারযোগ্য ডিজাইনের দুটি আকর্ষণীয় টেবিল এবং একটি অত্যাধুনিক ওয়াশরুমের সুব্যবস্থা রয়েছে রুমটিতে। ওয়াশরুমের সৌন্দর্য আসলে নজর কাড়া! গোসল করার জন্য বাথট্যাব ব্যবহার ও নির্দেশিকা সেখানে

লেখা রয়েছে। টেবিলের ড্রয়ারে অন-টাইম ছোট্ট পেষ্ট, ছোট্ট সাবান ও টি ব্যাগসহ অন-টাইম সুগারপ্যাক রাখা রয়েছে। চা বা কফি করার সুব্যবস্থা দেখে আমার খুব আয়েশি ভাব হলো। শীতেল হাওয়া মাঝে মাঝেই আমাকে আমাদের দেশের সমুদ্র সৈকতে থাকার আনন্দের শিহরণ মনে করাচ্ছিলো। তবু রুমটিতে সাজিয়ে রাখা বালিশ ও তোশকের সঙ্গে রুমটি গরম করার হিটার আমার মন কেড়ে নিলো।

নিউজিল্যান্ডের পথে আমাদের ঢাকা শহরের মতো এতো গাড়ির চাপ নেই। ট্রাফিক পুলিশ নেই বললেই চলে। তথাপি আমার নজর কাড়লো লোকেরা ইলেকট্রনিক ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে গাড়ি না থাকা সত্বেও দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সিগন্যাল মেনে রাস্তা পাড় হচ্ছে। রাস্তা এতোটা পরিস্কার পরিছন্ন যে, সেখানে কোন ছোট্ট কাগজের একটা টুকরাও অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে খুজে পাওয়া যাবে না। আসলে এই দেশের লোকেদের দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং পরিষ্কার পরিছন্নতা আলাদা।

রাস্তার বাঁকে বাঁকে বিভিন্ন ধরনের গাছের ডালে ফুলের সমারোহ। গাছগুলোকে বিশেষ সেফ দেওয়া হয়েছে, সৌন্দর্য ফুটে উঠছে বিল্ডিং বা পাশ্ববর্তী ভবনগুলোর আকৃতির সাথে ম্যাচ করে। স্থানীয় নিউজিল্যান্ডের লোকেরা ভীষণ কর্মব্যস্ত। আমাদের দেশের মানুষের মতো বসে বা দাড়িয়ে গসিপ করার মতো অবকাশ তাদের নেই। প্রয়োজনীয় সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষ হলে তারা ভদ্রতার সাথে বিদায় বলে স্থান ত্যাগ করে। সাহায্য করার মানসিকতা ওদের মজ্জাগত মনে হয়।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে বার, ক্যাসিনো এবং প্রসেস ফুডের দোকান। লাইন করে সকলে নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছে এবং নিয়ম মেনে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশের মতো বাড়িতে রান্না করে খাওয়ার প্রবণতা ওদের মধ্যে নেই। এতোটা সময়ের অপচয় তারা করতে চায় না। যা হোক, ভারতীয় কিছু রেস্টুরেন্টে বাঙালিয়ানা খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে ১-৫ নিউজিল্যান্ডের ডলারে খুব আয়েশি খাবার খাওয়া সম্ভব।

প্যাকেট দুধ ও রুটির দাম এখানে খুবই কম। এতো কম দামে দুধ ও রুটি পেয়ে আমাদের অনেকে এই দেশে থাকার সময়গুলো রুটি দুধ বা জ্যাম জেলির সাথে মজা করে খেয়েছে। চকলেট বা প্যাকেটজাত খাদ্যের সমারোহ খুব ভালো লেগেছে। দেশে নিয়ে যাবার জন্য এগুলো বিদেশিরা ক্রয় করে।

আমিও তাদের ব্যতিক্রম নয়, আমিও কিনে সঙ্গে রেখেছি।

সবচেয়ে ভালো লেগেছে নিউজিল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতি। প্রতি শ্রেণীতে বিশজন শিক্ষার্থী মাত্র। তাদের প্রত্যেকের কাছে স্মার্ট ফোন বা ট্যাব রয়েছে। টেক্সট বুক তেমন নেই বললেই চলে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রতিদিনের লেকচারে পরীক্ষা নিজে করে দেখান তারপর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাটি নিজে ঘুরেঘুরে পর্যবেক্ষণ করেন। মিনিট পাঁচেক গুগল সার্চের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ঘটান এবং সবশেষে ক্যায়াহুট সফটওয়্যারে বিষয়টির উপর দশমিনিটের এমসি কিউ পরীক্ষা গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করেন। শিক্ষার্থী একটা ক্লাস শেষ করে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর অন্য ক্লাসে পৌঁছায়। সেখানে পূর্ব থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি সেরে রাখেন।

নিউজিল্যান্ডের মিউজিয়ামে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তারা ফুটিয়ে তোলে। বিভিন্ন মনোরম দৃশ্য ফুটিয়ে তোলেন এবং ঐতিহাসিক মুহূর্তে প্রতিকৃতি সংরক্ষণ করা হয়েছে প্রদর্শনের জন্য। বাজনার তালে তালে এবং থ্রিডি প্রযুক্তির সমন্বয় করে আকর্ষনীয় করে তোলা হয়েছে। কৃত্রিম ঝর্ণা ও বৃষ্টি এবং শিশুদের খেলার সুব্যবস্থা রয়েছে সেখানে। মাওরি সম্প্রদায়ের পরিবেশনা আপনাদের মুগ্ধ করতে বাধ্য।

শিক্ষক হিসেবে ওভার সিজ ট্রেনিং করতে নিউজিল্যান্ডের দুটি সিটি ওয়েলিংটন ও অকল্যান্ডের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে ছোট্ট বেলার ছবিগুলোর বাস্তব উপস্থিতি সামনে দেখে চমৎকৃত হয়েছি। হাতে কলমে শিক্ষার স্থায়িত্ব ও দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষণের গুরুত্ব বোঝার সাথে সাথে শিখতে পেরেছি সভ্য সমাজের রীতিনীতি ও চারপাশেই সমুদ্র দিয়ে ঘেরা দ্বীপ রাষ্ট্রের মানুষের মনের সৌন্দর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে হারিয়ে দেওয়ার অবিশ্বাস্য গল্পের নীতিশিক্ষা।

নড়াইল, বাংলাদেশ

উমগটের আয়নায় মেঘের ছায়া

মধুমিতা দত্ত

"ওগো মেঘ তুমি উড়ে যাও কোন ঠিকানায় ...." সেই এক টুকরো মেঘের আলয়ের ঠিকানা জানার অদম্য কৌতূহল ও আকর্ষণ নিয়ে কোন এক সূর্য উঠা ভোরের আলোয়, আমরা বেরিয়ে পড়লাম মেঘালয়ের পথে- যেখানে আকাশ নামে পাহাড়ের কাঁধে আর প্রকৃতি সেজে উঠে নিজের ছন্দে ; আজকের আলোচ্য

প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য মেঘালয়ের পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাড়ি জেলায় অবস্থিত সীমান্ত শহর ডাউকি।

পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। মেঘালয়ের বুক চিরে বয়ে চলা হাওয়ায় এক অনাবিল শীতলতা। জানালার বাইরে চোখ রেখে দেখতে পাই গাঢ় সবুজে ঢাকা পাহাড়ের সারি, কখনো-বা গাছের ফাঁকে উঁকি দেওয়া ছোট ছোট জনপদ। কখনো ধুলো মাখা পথ, কখনো কুয়াশায় ঢাকা বন, আবার কখনো ঝরনার জল এসে পথ ছুঁয়ে গেছে। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের ঘরবসতি। মনে হলো মেঘ কখনো নিঃশব্দে নামছে , কখনো হঠাৎ উড়ে গিয়ে পাহাড়ের ঢালে হারিয়ে যাচ্ছে।আবার ঢেউয়ের মতো একের পর এক ঢেকে দিচ্ছে সবুজের আঙিনা। এ যেন এক জীবন্ত সত্তা-নাচছে, খেলছে, দোল খাচ্ছে বাতাসের ইশারায়।মেঘ এখানে শুধু প্রকৃতির এক উপাদান নয়, যেন পাহাড়ের আত্মা। স্থানীয় খাসি, জয়ন্তীয়া ও গারো জনগোষ্ঠীর কাছে মেঘের এই খেলা প্রকৃতির সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্কের অংশ। তাদের লোকগাথায়, সুরে, কবিতায় মেঘ বারবার ফিরে আসে-কখনো প্রেমের বার্তাবাহক হয়ে, কখনো-বা নিঃসঙ্গতার প্রতিচ্ছবি হয়ে। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট বাড়িগুলো যেন কোনো কল্পকাহিনির অংশ। রাস্তার ধারে চায়ের দোকান, গিটার হাতে তরুণদের গান, এক অনায়াস ছন্দময়তা -মেঘালয় যেন এক জীবনচিত্র!

মেঘালয়ের রাজধানী শিলং থেকে ডাউকীর দূরত্ব প্রায় ৮২ কিলোমিটার। পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দু'পাশে ঘন সবুজ বন, পাহাড়ের খাঁজে লুকানো ছোট ছোট ঝরনার জলধারা আর মাঝে মাঝে উঁকি দেওয়া রোদ্দুর এক স্বপ্নময় অনুভূতি এনে দেয়। পথে দেখা মেলে ছোট ছোট গ্রাম, যেখানে খাসি ও জয়ন্তীয়া জনগোষ্ঠীর মানুষজনদের সহজ সরল জীবনযাত্রা।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছেই অবস্থিত মেঘালয়ের ডাউকি এক অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্বর্গ; যেখানে স্বচ্ছ নদী, সবুজ পাহাড়, ঝরনা আর সীমান্তের বৈচিত্র্যময় দৃশ্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। কিছু উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হলো-

উমগট নদী (Umngot River) বা 'গাস রিভার'; ডাউকির সবচেয়ে বিখ্যাত আকর্ষণ উমগট নদী, যা বিশ্বের অন্যতম স্বচ্ছতম নদী হিসেবে পরিচিত। নদী কি শুধু জলধারা? নাকি সে এক প্রবহমান কবিতা, যার প্রতিটি ঢেউ গুনগুন করে অজানা সুর? মেঘালয়ের ডাউকির অরণ্যঘেরা কোলে বয়ে চলেছে উমগট। দূর থেকে তাকালে মনে হয়, কাচের এক

বিস্তৃত আস্তরণ বিছানো আছে সবুজ পাহাড়ের মাঝে। নৌকো যেন বাতাসে ভাসছে, নিচে তার ছায়া স্পষ্ট, যেন আকাশ নদীর বুকে প্রতিফলিত হয়েছে। নদীর নিচের নুড়ি পাথরগুলো এমন স্পষ্ট দেখা যায়, মনে হয় হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলা যাবে। অথচ গভীরতা বোঝা যায় না! পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা নদীর আপন ছন্দে বয়ে চলার মধ্যে এক প্রশান্ত সৌন্দর্য। বর্ষায় সে ভিন্ন রূপ নেয়, তখন তার বুকে তীব্র স্রোত, পাহাড়ের পাথরে আছড়ে পড়ে বুনে চলে এক গর্জনময় সংগীত। কিন্তু শীতকালে সে যেন এক নিস্তব্ধ সাধক, ধ্যানমগ্ন, নিজেকে মেলে ধরেছে প্রকৃতির সামনে। ডাউকি সেতুর নিচে দাঁড়িয়ে উমগটের দিকে তাকালে মন বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তা ছাড়া সাসপেনশন ব্রিজ বা ঝুলন্ত ব্রিজ ছাড়াও আছে ডাউকি বাংলাদেশ সীমান্ত ,বারাহিল জলপ্রপাত ,শ্নংপেডেং (Shnongpdeng), নীলচে স্বচ্ছ জলধারার ক্রাং সুরি জলপ্রপাত (Krang Suri Falls), জ্যাসপার লেক ,লিভিং রুট ব্রিজ ইত্যাদি ।

বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে গিয়ে মনে হলো , প্রকৃতি কোনো সীমারেখা মানে না- জল, বাতাস, পাহাড় সব একসঙ্গে মিশে আছে এক অনির্বচনীয় ভালোবাসায়। ডাউকি শুধু মেঘালয়ের একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান নয়; এটি ভারত-বাংলাদেশের বাণিজ্য, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । ১৯৪৭ সালে দেশভাগের আগেও এই অঞ্চল ছিল আসাম ও বাংলার মধ্যে পণ্য আদান-প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ পথ।

ঐতিহাসিকভাবে, ডাউকি অঞ্চলটি প্রাচীনকাল থেকেই আসাম, মেঘালয় ও বাংলার মধ্যে বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। ব্রিটিশরা এখানে রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ করেছিল যাতে পণ্য পরিবহণ সহজ হয়। এখানকার মানুষ প্রধানত কৃষি, মৎস্যচাষ ও সীমান্ত বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। ডাউকি সাসপেনশন ব্রিজটি ব্রিটিশদের সময় নির্মিত (১৯৩২ সালে) হয় । এই ব্রিজ আজও ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় খাসি ও জয়ন্তীয়া জনগোষ্ঠীর ব্যবসায়ীরা লবণ, চাল, শুকনো মাছ, সুপারি এবং হাতের তৈরি সামগ্রী এই পথ ধরে আদান-প্রদান করতেন।বর্তমানেও ডাউকি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্যপথ। এখান দিয়ে প্রচুর পরিমাণে কয়লা, চুনাপাথর, চা, ফলমূল ও অন্যান্য

পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি হয়। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সুষ্ঠু বাণিজ্য সম্পর্ক গঠনে এই সীমান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া প্রতি বছর এখানে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে "ফ্রেন্ডশিপ মেলা" অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দুই দেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে উদ্‌যাপন করা হয়।

ডাউকি শুধুই একটি সীমান্ত শহর নয়, এটি এক অনন্য সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের স্থান, যেখানে প্রকৃতি, ইতিহাস ও মানুষের জীবনধারা একসঙ্গে মিশে আছে। এখানে বসবাসকারী খাসি, জয়ন্তীয়া ও গারো জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতির প্রতিটি দিকেই প্রকৃতির সঙ্গে অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। এখানকার মানুষজন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ।স্থানীয় গ্রামগুলোতে গেলে দেখা যায় বাঁশের তৈরি বাড়ি, ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত মানুষ, এবং তাদের নিজস্ব খাদ্য সংস্কৃতি।

ডাউকির প্রধান জনগোষ্ঠী খাসি ও জয়ন্তীয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষা হলো খাসি । এ ছাড়া, সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশি ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্য হিন্দি, ইংরেজি ও বাংলা ভাষাও প্রচলিত আছে। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে খাসিরা প্রধানত খ্রিষ্টান, তবে অনেকেই এখনও তাদের প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে। তাদের মধ্যে প্রকৃতিপূজা প্রচলিত, যেখানে জল, বন ও পাহাড়কে দেবতার মতো সম্মান করা হয়। জয়ন্তীয়ারা অনেকাংশে খ্রিষ্টান হলেও, তাদের ঐতিহ্যবাহী দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে।

ডাউকির জনগণের জীবনে উৎসবের বিশেষ গুরুত্ব আছে। শাদ সুক মাইস্যেম (Shad Suk Mynsiem) খাসি সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব, যেখানে নাচগানের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। বেহ দেনখলম (Beh Dienkhlam), জয়ন্তীয়া জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব।

ডাউকির খাদ্যসংস্কৃতিতে খাসি ও জয়ন্তীয়া প্রভাব স্পষ্ট। তাদের খাবারে প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। জাদো (Jadoh)খাসি সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় খাবার, যা মূলত মাংস ও চালের মিশ্রণ দিয়ে তৈরি। টুনগ্রিমবাই (Tungtap), একধরনের শুঁটকি মাছের চাটনি, যা ভাতের সঙ্গে খাওয়া হয়।ডোকসিয়ে (Doh Snam), শূকরের মাংসের একটি বিশেষ রান্না, যা স্থানীয়দের মধ্যে জনপ্রিয়।তা ছাড়া নদীর স্বচ্ছ জলে ধরা মাছ দিয়ে তৈরি খাবার এখানকার বিশেষত্ব; বিশেষত তাজা গ্রিলড মাছ ও কারি।

ডাউকির মানুষের পোশাকে তাদের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। খাসি নারীরা 'জাইনসেম (Jainsem)' নামে পরিচিত এক বিশেষ পোশাক পরেন, যা উজ্জ্বল রঙের কাপড়ে তৈরি।পুরুষরা সাধারণত 'জাইনখির (Jainkyrshah)' নামে একটি আলগা জামা পরেন, যা কাঁধে জড়ানো থাকে। তা ছাড়া বিশেষ অনুষ্ঠানে তারা হাতে তৈরি রুপার গয়না পরেন, যা তাদের ঐতিহ্যের অংশ।

ডাউকি, যা এতদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এক মনোরম প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল, এখন নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক উন্নয়ন ও নতুন উদ্ভাবন ডাউকিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন, পরিবহণ ও বাণিজ্যিক হাব হিসেবে গড়ে তুলছে।

ফেরার পথে পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা মেঘেরা যেন আবার ডাক দিচ্ছিল। পাহাড়ের বাতাস এসে বারবার মনে করিয়ে দিল- মেঘালয় কেবল একটি জায়গা নয়, এক অনুভূতি, এক রঙিন স্মৃতি।সে অনুভূতি রয়ে যাবে চোখে, মনে, আর অন্তরের গহিনে-মেঘ হয়ে, বাতাস হয়ে, পাহাড়ের ডাক হয়ে। শুধু হাওয়ার শনশন শব্দে লুকিয়ে ছিল বিচ্ছেদের কান্না,আর ছিল আবার ফিরে আসার নীরব আমন্ত্রণ। নীল আকাশের নিচে, সবুজ পাহাড়ের কোলে, স্বচ্ছ জলের শহর ডাউকি আমার মনে রেখে দিল এক টুকরো শান্তি, এক বিন্দু বিস্ময়।ফেরার পথে বুঝলাম, প্রকৃতির কাছে গেলে আমরা যেন আরও আপন হয়ে উঠি,আরও গভীরভাবে জীবনকে ছুঁয়ে দেখতে পারি।মনে হলো, ভ্রমণ কখনো ফুরোয় না।ব্যাগের ভেতরে শুধু পোশাক নয়, জমে থাকে গল্প, মানুষের মুখ, পথের ধুলো।মনে হয়, আবার কোথাও যেতে হবে,কোনো এক নতুন গল্প অপেক্ষা করছে! হয়তো কোনোদিন, কোনো এক মেঘের সকালে ফিরে আসব, পাহাড়ের কানে কানে বলব-"আমি আবার এসেছি!"

গৌহাটি, আসাম

স্বর্গীয় সৌন্দর্যের লীলাভূমি গিলান

মুমতাহহিনা খাতুন

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দেশ ইরানের সৌন্দর্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। ৩২টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত বৃহত্তর ইরানের এক একটা প্রদেশ যেন এক একটা দেশ। যা একটার সাথে অন্যটার তুলনা হয় না। প্রতিটি প্রদেশে রয়েছে নিজস্ব অপরূপ সৌন্দর্যের নৈসর্গিক বিশালতা। আর সকল অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর প্রদেশ সমুহের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি গিলানের কথা উঠে আসে সবার আগে। ইরানের উত্তরের একটা প্রদেশ গিলান। প্রায় পনেরো বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট গিলানের উত্তরে রয়েছে বিশাল ক্যাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিনে কাজভিন , পূর্বে মাজান্দরান, উত্তর-পশ্চিমে আরদাবিল এবং পশ্চিমে রয়েছে জানযন প্রদেশ। গিলানের রাজধানী শহর রাশত। যা ইরানের রাজধানী তেহরানের থেকে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

রাশত ইরানের একটি বিখ্যাত এবং উন্নত শহর হিসেবেও পরিচিত। এছাড়া গিলানের পর্যটন শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে মসাল, মসুলেহ, আস্তারা লাহিজান ও বান্দার আনজালী। গিলানের সৌন্দর্য, কৃষ্টি-কালচার, খাবার , পোশাক-পরিচ্ছেদ ও ভাষার রয়েছে আলাদা কদর– যা বিদেশীদের পাশাপাশি ইরানীদেরও আকর্ষণ করে। এই গিলানেই সুবিশাল গাছে ঢাকা পাহাড়, পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে চলা আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু রাস্তা, পাহাড়ী ঝর্ণা, পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট-ছোট্ট নদী, ঘন জঙ্গল, বিশাল চা বাগান, পাহাড়ের মধ্যে গড়ে ওঠা কাঠের উঁচুনিচু বাড়ি আর অন্যপাশে রয়েছে সুবিশাল সমুদ্র।

গিলানের আবহাওয়া অনেকটা বাংলাদেশের আবহাওয়ার মত। আর্দ্রতা অনেক বেশি আর পাহাড় সমুদ্র বৈশিষ্ট হওয়ায় স্যাত-স্যাতে ভ্যাপসা ভাব রয়েছে। গরমকালে গিলানের তাপমাত্রা প্রায় ৩০° থেকে ৩৫° পর্যন্ত হয়ে থাকে আর শীতকালে তা অনেক সময় (-) এ নেমে আসে। যদিও শহর ভেদে তাপমাত্রা বিশাল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গরমের সময় সমুদ্রের কাছের শীতল বাতাস যেমন এক আরামের উৎস, ঠিক তেমনি শীতকালে পাহাড়ের চূড়ায় বরফে ঢাকা তুলারাশির মত সৌন্দর্য গিলানের সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করে। আসলে পুরো গিলানের সৌন্দর্য কথা বলে এবং দেখে শেষ করা যাবে না। তবে পর্যটকদের জন্য, যারা গিলান ভ্রমন করতে চায়– তাদের জন্য বেশ কিছু শহরের নাম এবং বিখ্যাত জায়গা গুলোর কথা উল্লেখ না করলেই নয়।

১. রাশত: পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, গিলানের রাজধানী শহর হলো রাশত। যা একটি উন্নত শহর। এই শহরের দালান, রাস্তাঘাট ও বাজারগুলো অতি প্রাচীন। আর সাথে রয়েছে বিখ্যাত সব রেস্তোরা। এই শহরের প্রতিটি রাস্তাঘাট গিলানের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে।

২. লাহিজান: চা'য়ের জন্য বিখ্যাত লাহিজান, যা গিলানের একটি বিখ্যাত শহর। সুবিশাল উঁচুনিচু পাহাড়ের গা ঘেসে চা'য়ের বাগান সত্যিই পর্যটকদের মুগ্ধ করে।

৩. রূদরব: জলপাই এর শহর নামে খ্যাত। চারিদিকে পাহাড় দ্বারা আবৃত ও নদীর কুল ঘেষে গড়ে ওঠা শহর

রূদবর। পুরো ইরানে এখান থেকে জলপাই সংগ্রহ করা হয়।

৪. মসাল: আকাশচুম্বি পাহাড় আর বড় বড় গাছের সমারহে ঘেরা শহর মসাল। পাহাড়ের বুকচিরে আঁকাবাঁকা বয়ে চলা রাস্তাঘাটগুলোই মসালের মূল সৌন্দর্য। আর উপর থেকে নিচের দিকে চলা ঝর্ণার স্বর্গীয় শব্দ এই শহরকে জাগিয়ে রাখে।

৫. মসুলেহ: পাহাড়ের উপর গড়ে ওঠা একটার উপর আরেকটা সাজানো কাঠের বাড়িগুলোই মসুলেহের আসল সৌন্দর্য। এই বাড়িগুলোর গঠন সত্যিই বিষ্ময়কর আর অতি মুগ্ধকর।

৬. বান্দারে আনজালী: কাস্পিয়ান সাগরের তীরে গড়ে ওঠা শহর আনজালী । সামুদ্রিক সৌন্দর্যে পাশাপাশি এখানে বন্দর গড়ে উঠায় ব্যবসা- বানিজ্যের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে আছে গিলানের এই শহরটি।

৭. আস্তারা: কাস্পিয়ান সাগর ঘিরে গড়ে ওঠা শহর আস্তারা। সমুদ্র প্রেমিদের জন্য এক অন্যরকম নান্দনিক বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

কীভাবে যাবেন;

১. কোন বাংলাদেশি যদি ইরান ভ্রমনে আগ্রহী থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে পর্যটন কিংবা ধর্মীয় জিয়ারতের ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। ভিসা কনফার্ম হয়ে গেলে ইরান দূতাবাস থেকে ভিসা সংগ্রহ করতে হবে।

২. যেহেতু বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে বর্তমানে কোনো সরাসরি ফ্লাইট নাই, তাই ওমান, দুবাই, কাতার কিংবা তুর্কি হয়ে যাওয়া লাগে। এক্ষেত্রে যাতায়াত ভাড়া প্রায় এক লক্ষ টাকা।

৩. তেহেরানে পোঁছানোর পর তেহেরান থেকে বিমান, ট্রেন, বাস এমনকি প্রাইভেট কারে সরাসরি রাশতে যাওয়া যায়। বিমানে ৪০ মিনিট এবং বাস, ট্রেন ও প্রাইভেট গাড়িতে প্রায় ৪ থেকে ৫ ঘন্টা সময় লাগে। যোগাযোগের ব্যবস্থা খুবই উন্নত।

কোথায় থাকবেন;

গিলানের প্রতিটা শহরে পর্যটকদের জন্য অসংখ্য হোটেল, সুইট এমনকি ব্যক্তিগতভাবে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। বাংলাদেশি টাকার সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা থেকে শুরু হয় ভাড়াগুলো।

খাবার;

হোটেলে খাবার সুবিধা থাকলেও সুইট এবং ভাড়া করা বাসা গুলোতে

নিজেদেরকেই খাবারের ব্যবস্থা করে নিতে হয়। গিলানে যেহেতু বিদেশি পর্যটকদের জন্য আলাদা কোনো রেস্তোরাঁ নাই , তাই বাধ্য হয়ে ইরানি খাবারই খেতে হয়। বিখ্যাত গরম রুটির সাথে টাটকা ভেড়ার গোস্তের কাবাব এবং কলিজার কাবাব। গিলানের বিখ্যাত খাবার হলো মির্জা কাশেমি (বেগুন ও ডিম দিয়ে তৈরি এক প্রকার বেগুনের ঘাটি)। অতি সুস্বাদু খাবার। পুরো ইরানেই অনেক নামকরা খাবার এটা । আর সাথে রয়েছে বিভিন্ন পদের সবজি ও ফলের আচাড়। এছাড়া রেস্তোরাঁ গুলোতে বিভিন্ন পদের খাবার পাওয়া যায়।

যার মধ্যে রয়েছে সমুদ্রের তাজা মাছের ভাজা (বেরেনযে শুমালী)নামে খ্যাত গরম ইরানি সুগন্ধী চালের ভাত।

খরচ;

১. বাংলাদেশের থেকে ইরানের যাতায়াতের খরচ ১ লক্ষ টাকা।

২. তেহরান থেকে গিলান (রাসত) বাস, ট্রেন কিংবা প্রাইভেট গাড়িতে যাতায়াত খরচ ২ হাজার টাকা আর বিমানে ৪ হাজার টাকা।

৩. হোটেল, সুইট কিংবা বাড়িভাড়া ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০০ টাকা থেকে শুরু হয়ে থাকে।

৪. খাবার নির্ভর করে নিজের উপর। তবে ভাত, রুটি, মাছ-মাংশ জাতীয় খাবার ২০০০ টাকা কিংবা তার উপরে খরচ হতে পারে।

ভ্রমণের উত্তম সময়;

যেহেতু ইরান শীত প্রধান দেশ, তাই উত্তম সময় হলো গরমের শেষে আর শীতের শুরুর দিকে। অর্থাৎ জুন-জুলাই গিলান ভ্রমনের উত্তম সময়। না ঠান্ডা না গরম।

সবমিলিয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে যে, প্রকৃতি ভালোবাসে ও সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেয়–তাদের জন্য গিলানের চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।

শিক্ষার্থী, আল-যাহরা ইউনিভার্সিটি।
তেহরান, ইরান।

মনে হারানো এক পৃথিবী

নুসরাত জাহান

একটি নীরব ও রহস্যময় ভোরে, যখন সূর্য তার সোনালী কিরণ ছড়িয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করতে শুরু করেছিল, আমি বেরিয়ে পড়লাম এক অসীম পথে, যেখানে ছিল শুধু প্রকৃতির নিঃশব্দ আহ্বান। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন আমি এক নতুন আঙ্গিকে পৃথিবীটাকে দেখছিলাম, এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে

অনুভব করছিলাম। বনের গাছগুলোর হালকা শিস, পাহাড়ের ধ্বনি, আর বাতাসের মৃদু নিঃশ্বাস-সব কিছু যেন আমাকে কাছে ডেকে এনে এক অদ্ভুত শান্তিতে পূর্ণ করছিল।

নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে, আমি চোখ মেলে দেখলাম স্বচ্ছ জলরাশি, যেন অতি গভীরে কোনো অতীন্দ্রিয় রহস্য লুকিয়ে রেখেছে। ঢেউগুলো আসছিল আর চলে যাচ্ছিল, একেবারে সময়ের মতো। অনুভব করলাম, এই নদী শুধু জল নয়, এটি জীবনের এক অবিরাম প্রবাহ, যেখানে অশান্তি, শোক, আনন্দ, এবং শান্তি সবকিছু মিশে রয়েছে। আর আমি, সেই জলধারার মতোই, অবিরাম যাত্রা করে চলেছি, একটি ধ্রুবক সন্ধানের পথে।

তখন, প্রাকৃতিক বর্ণমালার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আকাশের সীমানা আর পৃথিবীর মিলন বিন্দুতে আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছি। কেমন যেন এক অন্য জগৎ, যেখানে শুধু সুশান্তির উপস্থিতি, কোথাও কোনো গতি নেই, কোথাও কোনো দুশ্চিন্তা নেই। গাছের পাতায় শিশির বিন্দুর মতো কণ্ঠে, আমি বুঝতে পারলাম, প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সেই চিরন্তন সঙ্গীত, যা কেবল শোনা যায়, অনুভব করা যায়, কিন্তু শব্দে প্রকাশ করা অসম্ভব।

পথে চলতে চলতে, পর্বতের চূড়ায় পৌঁছালাম, যেখানে আকাশের সাথে মাটি একে অপরকে আলিঙ্গন করছে। সেখান থেকে নিচে তাকালে, নদীটি যেন এক নৃত্যশিল্পী, তার শরীরের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি ঝিলমিল যেন এক অসাধারণ শিল্পকর্ম। সেখান থেকে দূরে, সবুজ বনে আলোছায়ার খেলায় সূর্য যেন পৃথিবীকে এক নিঃশব্দ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে- ‘আমি ফিরে আসব, তোমাকে আলোকিত করব, আবার নতুনভাবে’।

এটি ছিল একটি স্বপ্নের মতো ভ্রমণ, যেখানে না শুধু পৃথিবী, বরং আমি নিজেও হারিয়ে গিয়েছিলাম, এক গভীর অভ্যন্তরীণ যাত্রায়। এই যাত্রায় আমি উপলব্ধি করলাম, প্রকৃতি শুধুই দৃশ্য নয়, এটি একটি অনুভূতি, একটি শক্তি, একটি সংযোগ-যা আমাদের আত্মার সাথে মিশে যায়, এক অন্য পৃথিবী সৃষ্টি করে।

সবুজের সমারোহে প্রাণবন্ত সফর

রবিউল হাসান আরিফ

জীবন যত এগোচ্ছে ততোই ব্যস্ততা আর জীবনযুদ্ধ স্বাগত জানাচ্ছে। প্রাণভরে ভ্রমণের স্বাদ নিচ্ছিনা অনেকদিন হলো। ভ্রমণ করতে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, তাই মন মন্দিরে ইচ্ছেরা জেগে উঠলো সুদূর খোলা আকাশের নীচে কোথাও গিয়ে ঘুরে আসা যাক। একা একা সফর করারচে বন্ধুদের সাথে কিংবা পরিবার নিয়ে হলে সেটা বেশ আনন্দের হয়, যা বলাইবাহুল্য। আগে থেকে কোন এক নিঝুম নিরিবিলি এলাকায় ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা ভাবনার অন্দরে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। জীবনের শুরু কিংবা মাঝলগ্নে তৃপ্তিময় মুহূর্ত উপহার পেতে বন্ধুরা তার অবিচ্ছেদ অংশ অনন্য উপমা। আগ্রহের সমুদ্রে ঢেউ দিচ্ছে, আলোচনা পর্যালোচনায় সঙ্গী সাথীদের মনোনিবেশ বেশি হলেও শেষের দিকে সংখ্যা দাঁড়ায় দশেরচে কম।

সেদিন বৃহস্পতিবার খুব সকালেই বেরিয়ে পড়ি চট্টগ্রাম মিরসরাই খৈয়াছড়ি অবস্থিত পাহাড় আর ঝর্ণার উদ্দেশ্যে, অজানাকে জানতে। প্রকৃতির প্রেম ডাকে মনোহরি সৌন্দর্যের ছোঁয়া নিতে, আর সৌন্দর্যে মিশে যেতে হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে, ভাবছি তার

সেই অমুঘ টান আমরা কি সত্যি উপলব্ধি করতে পারবো! তবুও কত ভীতির শঙ্কা ব্যতিরেখে সুজলা- সুফলা, শস্য-শ্যামলা প্রাকৃতিক সম্ভারে সবুজের সমারোহে উদ্বেলিত এই মনে ছুটে চলি অচিন রাজ্যে– অসীমের টানে। যতই নিকটে যাই যেনো শুধু মুগ্ধতা আর মুগ্ধতা। আঁকাবাঁকা মেঠোপথ, ছোট-বড় হরেক রকমের পাথর, হালকা বৃষ্টি, শীতল স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে চলছে। পাহাড়ের গিরিপথে পানির প্রবাহিত বহু ছোট্ট নালা ও অপরূপ দৃশ্যগুলো উঁকি দিচ্ছে। নয়নভরে উপলব্ধি করছি । সেই কবে থেকে এক পলক দেখার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনেছি, আজ চোখের সামনে সেই কাঙ্ক্ষিত ঝর্ণাধারা। সরুরাস্তা বেয়ে উঁচু পাহাড়ের চওড়া অতিক্রম করলেই আবিষ্কার করছি একেকটা ঝর্ণাধারার পাথরে ভূমি। পাথরের গা ঘেষে ঝর্ণাগুলোর সচ্ছ নির্মল ঠান্ডা পানির কলকল শব্দে হৃদয় উজাড় করে নেয়, মনের যত মলিনতা আর বিষন্নতা নিমিষেই নাই হয়ে যায়, প্রকৃতির প্রেমে হারিয়ে যায় দূর অজানায়।

সেখানকার পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু যে স্থানটি ওখানেও দড়ি এবং লাঠির সাহায্যে আবিষ্কার করেছি নিজেদের। উফ! কতইনা কসরত! একদিকে আনন্দও যেমন বেশ দোল খাচ্ছে, সেই সাথে ভয়েরও কমতি নেই , তবে বন্ধুরা থাকলে সাহসই তখন নিত্যসঙ্গী। ...
গাছগাছালী-তরুলতার প্রেমে পড়লে কোন কষ্ট যেনো কষ্টই থাকেনা, মানষিক প্রশান্তিরা ছোঁয়া দেয় প্রতিনিয়ত, মন চায় সারাজীবন থেকে যায়, অকল্পনীয় অনন্য এক আকর্ষণীয় স্থান। পাহাড়পানে মনে পড়ে যায় পাহাড়িদের জীবন বৃত্তান্ত। যাক পাহাড়িরা বুঝি এভাবেই জীবন যাপনে অভ্যস্ত তবুও কতো সুন্দর।
এ আনন্দ উপভোগে আর অনুভবের কত যে, আনন্দ তারাই উপলব্ধি করবে, যারাই ভ্রমণে বেরোবে। তাইতো প্রেমময় রব পবিত্র কালামে বহুবার বলেছেন ভ্রমণের কথা।

শিক্ষার্থী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া চট্টগ্রাম।

পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে একদিন

আলেমা রুজি আক্তার নিশাত

পাহাড়, নদী আর সমুদ্রেঘেরা এক মনোমুগ্ধকর জাদুকরী শহর হলো, আমাদের চট্টগ্রাম শহর। আর এই চট্টগ্রাম শহরের সাগরকন্যা বলা হয়, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে।

পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত হলো চট্টগাম শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয়, আকর্ষণীয় ও সহজলভ্য একটি সমুদ্র সৈকত। কর্মজীবী মানুষেরা তাদের কর্মব্যস্ত জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে কিংবা সাগরের ছোঁয়া পেতে হুট করে ছুটে যায় পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে।

সমুদ্রের ডাক আমি কখনোই উপেক্ষা করতে পারি না। ঢেউয়ের গর্জন, বালুর ওপর হেঁটে চলা আর সাগর বাতাসের স্পর্শ-সবকিছুই আমাকে জাদুর মত টানে। তাই আমিও একদিন বিকেলে হুট করে সিদ্ধান্ত নিলাম সমুদ্র ছুঁয়ে দেখার।

যাত্রার শুরু:

চট্টগ্রাম শহর থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত। তাই বেশি সময় লাগল না পৌঁছাতে। সিএনজিতে করে খুব দ্রুতই পৌঁছে গেলাম পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে। টাইগারপাস বোর্ডক্লাব নেভাল একাডেমি

আর শাহ আমানত বিমানবন্দর পেরিয়ে সৈকতের কাছাকাছি যেতেই কানে এল ঢেউয়ের গর্জন। গাড়ি থেকে নেমে সোজা ছুটলাম সমুদ্রের দিকে!

সমুদ্রের ঢেউ আর বাতাসের ছোঁয়া:
সৈকতে পৌঁছে দেখি, বিশাল সাগর। দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত! কিছুক্ষণ পরপর ঢেউ আছড়ে পড়ছে, বাতাসে লবণের গন্ধ, আর সূর্যের আলো পানিতে পড়ে ঝলমল করছে। বিকেলের নরম রোদে সমুদ্রের পানি সোনালি আভা ছড়াচ্ছিল। ঢেউ এসে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তটা সত্যিই যেন জাদুকরী! আর চারপাশে মানুষের কোলাহল-কেউ ছবি তুলছে, কেউ ঝালমুড়ি ফুচকা চটপটি খাচ্ছে, কেউ ঘোড়ায় চড়ছে, কেউ স্পিড বোর্ডে চড়ছে, কেউবা নীরবে বসে ঢেউ দেখছে।

বিচ ফুড:
পতেঙ্গায় আসা মানেই সামুদ্রিক খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা। সাগরের তাজা মাছ ভাজা, চিংড়ি মাছের পিঁয়াজু আর নানা রকম ভাজাপোড়া খেয়ে মনে হলো, সৈকতের স্বাদ যেন সত্যিই মুখে লেগে গেল!

সন্ধ্যার পতেঙ্গা: আলোর জাদু
সন্ধ্যা হতেই সৈকতের সৌন্দর্য যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেলো। আশপাশের রং বেরঙের লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে, সূর্যাস্ত ঢেউয়ের সাথে আলো-মাখা পানির খেলা দেখতে দারুণ লাগছিল। একটা বড় পাথরের ওপর বসে ঢেউয়ের শব্দ শুনতে শুনতে মনে হলো, সময় এখানেই থেমে থাকুক!

ফিরে আসা:
রাত ঘনিয়ে এলো, মন চাইছিল না ফিরে আসতে। কিন্তু ফিরতে যে হবে, তাই মনকে বুঝিয়ে সৈকত ছেড়ে শহরের দিকে রওনা দিলাম। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম-এই জায়গায় আবার আসব। বারবার আসবো।

পতেঙ্গা শুধু একটা সৈকত নয়, এটা এক অনুভূতি! এক পারফেক্ট জায়গা! যদি তুমি কখনো চট্টগ্রাম যাও, তাহলে অবশ্যই একবার পতেঙ্গায় গিয়ে এই অনুভূতি নিয়ো!

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

নীলগিরির নৈসর্গিক আহ্বান:

এক অবিস্মরণীয় ভ্রমণ

সাজিদ বিন আওলাদ

ছোট্ট এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন খনিকের জন্য, আর এই স্বল্প সময়ের মাঝেও স্বভাবসুলভ মানুষের মন চিরকালই অজানার পানে ছুটে চলে এসেছে। ভ্রমণই হলো সেই অজানার প্রতি আকর্ষণের বাস্তবায়ন। প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি ভুলে নতুন জায়গা দেখা, নতুন মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, প্রকৃতির শোভা উপভোগ করা-এগুলোই ভ্রমণের আসল আনন্দ। ভ্রমণ আমাদের মনের জানালা খুলে দেয়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করে।

আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ২ মার্চ ২০২৩ সালে এক অনন্যাসাধারণ অভিযানে বের হয়েছিলাম-গন্তব্য ছিল প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের আধার, বান্দরবনের নীলগিরি। এই ভ্রমণ কেবল পাহাড় দেখা ছিল না; ছিল রোমাঞ্চ, সাহচর্য আর অজস্র স্মৃতি সঞ্চয়ের এক সুবর্ণ সুযোগ।

প্রস্তুতি ও যাত্রার শুরু:

সবাই মিলে সিদ্ধান্ত হলো, আমাদের ভ্রমণ শুরু হবে সাভারের জাতীয়

স্মৃতিসৌধের মসজিদ থেকে। দুপুর ১২টার মধ্যে সবাই সেখানে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। যথাসময়ে আমরা সেখানে একত্রিত হলাম, যোহরের নামাজ আদায় করে গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। গুলিস্তান হয়ে কমলাপুর রেলস্টেশনে পৌঁছালাম মাগরিবের কিছু আগে। সেখানে রাত ৯টার মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য অপেক্ষা। ট্রেনযাত্রার আগ্রহ ছিল অসীম, কারণ রাতের ট্রেনযাত্রার মধ্যে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ লুকিয়ে থাকে। রাতের ট্রেনযাত্রা ও প্রকৃতির মায়াবী দৃশ্য।

রাত ৯টা বাজতেই ট্রেনের হুইসেল বাজল, আর আমাদের ভ্রমণপথ নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করল। জানালার পাশে বসে দেখতে থাকলাম, চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে পিছনে পড়ে থাকা শহরের আলোকবিন্দু। ধীরে ধীরে শহরের কোলাহল পেছনে পড়ে যেতে লাগল, আর ট্রেন ঢুকে গেল প্রকৃতির অজানা রাজ্যে। চারপাশের অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ গাছপালার ছায়া যেন মৃদু নাচতে লাগল, আর দূর পাহাড়ের আবছা রেখা মেঘের সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করল এক রহস্যময় দৃশ্য। কখনো কখনো মেঘ এতটাই নেমে আসছিল যে, মনে হচ্ছিল, আমরা যেন তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

বন্ধুরা মিলে গল্পগুজব, চা-কফির চুমুকে যাত্রা আরও উপভোগ্য করে তুললাম। রাত গভীর হতে থাকলে সবাই ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম পাহাড়ের আঁধারে ঢাকা মায়াবী পরিবেশ, কোথাও কোথাও ছোট ছোট বাতি জ্বলছিল, যা মনে করিয়ে দিচ্ছিল কোনো পাহাড়ি গ্রামের অস্তিত্ব। প্রকৃতির এই নয়নাভিরাম দৃশ্য আমাদের সকল ক্লান্তি মুছে দিল। সকালে যখন ট্রেন চট্টগ্রাম পৌঁছালো, তখন সূর্যের আলো পূবাকাশে স্বর্ণাভ আভা ছড়াচ্ছিল।

চট্টগ্রাম থেকে বান্দরবান ও নীলগিরির পথে:

চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে প্রথমে সকালের নাস্তার পর্ব শেষে, বাসে করে আমাদের যাত্রা শুরু হলো বান্দরবানের উদ্দেশ্যে। বাসে আমাদের সাথে আরো অনেক যাত্রী ছিল। তারাও ভ্রমণে বের হয়েছে। বাস কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা ছোট-ছোট পাহাড় দেখেই আনন্দে হইহোল্লা করতে থাকি । পাহাড়ি পথের মোহময় দৃশ্য আমাদের মনকে সজীব করে তুলল। বান্দরবান পৌঁছে আমরা চাঁদের গাড়ি ভাড়া করলাম, যার চালক ছিলেন

নীরব শান্ত প্রকৃতির হাস্যোজ্জ্বল এক ব্যক্তি। তার অভিজ্ঞ হাতে গাড়ি চলতে লাগল আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে। সামনের সকল গাড়িকে একের পর এক ওভারটেক করতে করতে তিনি যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তা একদিকে যেমন শিহরণ জাগাচ্ছিল, অন্যদিকে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করছিল রোমাঞ্চকর উচ্ছ্বাস।

পথের সৌন্দর্য ও বিভিন্ন স্পট ভ্রমণ:

নীলগিরির পথে আমরা প্রথমে শৈলপ্রপাত নামের এক মনোরম জলপ্রপাতের কাছে থামলাম। ঝর্ণার স্বচ্ছ পানির ধারায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে যেন রঙধনুর আভা তৈরি করছিল। ঠান্ডা পানির শব্দ মনকে প্রশান্ত করছিল, আর আমরা সবাই কিছুক্ষণ সেই মনোরম পরিবেশে হারিয়ে গেলাম। এরপর গেলাম মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে, যেখানে সুবিশাল হ্রদের উপর নির্মিত সেতু দিয়ে হাঁটার অনুভূতি সত্যিই অসাধারণ ছিল। হ্রদের শান্ত জলে আশপাশের সবুজ পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি যেন এক নতুন জগতের সৃষ্টি করছিল।

এরপর আমরা পৌঁছালাম চিম্বুক পাহাড়ে, যা বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বত। এখান থেকে দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছিল, যার উপর দিয়ে সাদা তুলোর মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। ঠান্ডা বাতাসে দাঁড়িয়ে আমরা পাহাড়ের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে গেলাম।

নীলগিরিতে অভিজ্ঞতা:

নীলগিরি পৌঁছানোর পর মনে হলো যেন আমরা মেঘের রাজ্যে প্রবেশ করেছি। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম এক অসীম বিস্তৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম বাতাসের ঠান্ডা ছোঁয়া। চারপাশের মেঘের সাদা আবরণ মাঝে মাঝে ফাঁক হয়ে নিচের উপত্যকা দৃশ্যমান করে দিচ্ছিল। কখনো মেঘের ঘনত্ব এত বেশি হয়ে যাচ্ছিল যে, সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। সূর্যের আলো যখন মেঘের উপর পড়ে ঝলমল করছিল, তখন প্রকৃতি এক স্বপ্নিল রূপ নিল।

আমরা পাহাড়িদের কাছ থেকে তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার খেয়েছিলাম- জুমচাষের চালের ভাত, বাঁশের চোঙায়

রান্না করা মাংস, পাহাড়ি মধু, নানা ধরনের শাকসবজি ও বনফল। প্রতিটি খাবারের স্বাদ ছিল ভিন্ন, আর এটি আমাদের জন্য নতুন এক অভিজ্ঞতা এনে দিল।

এখানে আমরা এক ব্রিটিশ পর্যটকের দেখা পেলাম। তার সাথে কুশল বিনিময়ের পর সবাই মিলে ছবি তুললাম। আমাদের দেখে অন্যান্য পর্যটকরাও তার সাথে ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করল। এমন বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা সত্যিই বিরল।

ফেরার পথে স্মৃতির সঞ্চয়:

নীলগিরি থেকে ফেরার পথে আবার কয়েকটি স্থানে থামলাম। পাহাড়িদের হাতে তৈরি নানা কারুকার্য ও শৌখিন সামগ্রী কিনলাম। কাঠ ও বাঁশের তৈরি স্মারকচিহ্নগুলোর মধ্যে ছিল পাহাড়ি সংস্কৃতির ছোঁয়া। মেঘের দেশে কাটানো মুহূর্তগুলোর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করেই ফিরে চললাম।

সমাপ্তি ও ফিরে আসার অনুভূতি:

রাতের ট্রেনে ফিরে আসার সময় এক ধরণের প্রশান্তি কাজ করছিল। জানালা দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, প্রকৃতির এই অনাবিল সৌন্দর্য কেবল বইয়ে পড়লেই বোঝা যায় না, তাকে অনুভব করতে হয়। পাহাড়, মেঘ, ঝর্ণা, সংস্কৃতি-সব মিলিয়ে নীলগিরি ছিল আমাদের জীবনের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এই ভ্রমণ শুধুমাত্র একটি যাত্রা ছিল না, বরং ছিল এক টুকরো স্বপ্নের মতো, যা আমাদের মনে চিরদিন অমলিন হয়ে থাকবে। যার প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতি স্মৃতির পাতায় সোনালী হরফে লেখা থাকবে। মাঝে-মাঝে স্মৃতির পাতা উল্টে হারিয়ে যাবো সেই প্রকৃতির অপরূপ মায়ার বাঁধনে।

শিক্ষার্থী, জামিয়াতুল উস্তায শহিদুল্লাহ ফযলুল বারী (রহি)
ওয়াশপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

স্মৃতিকথা

সানজানা আক্তার

স্মৃতি থেকে যায় হৃদয়ের গভীরে। আমাদের স্মৃতিই আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে। আমরা যা শিখি, যা অনুভব করি, তার সবকিছু স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা থাকে।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে তেমনই এক স্মৃতি-বিজড়িত দিন ১৬ জানুয়ারি ২০২৫। এই দিনে আমাদের কলেজ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় হরিণঘাটা ইকোপার্ক এবং সেখান থেকে লালদিয়া সমুদ্র সৈকতে।

আমি আর আমার বান্ধবী ১৬ তারিখ সকাল সাতটার মধ্যেই কলেজ প্রাঙ্গণে পৌঁছে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, কলেজ ড্রেস পরিহিত চঞ্চল ছাত্রীদের উচ্ছ্বাসে মুখরিত পুরো ক্যাম্পাস। কলেজ গেটের সামনে সারিবদ্ধভাবে বাস দাঁড়িয়ে আছে। সকালের নাস্তা দেওয়া হয়। নাস্তা শেষ করে নির্ধারিত বাসে উঠে পড়ি।

আমরা পিরোজপুর থেকে হরিণঘাটার উদ্দেশ্যে সকাল আটটার দিকে রওনা হই। বাসের মধ্যে হাসি-ঠাট্টার মাঝে কখন যে, হরিণঘাটায় পৌঁছে গেছি, খেয়ালই ছিল না!

বাস থেকে নেমে আমরা হরিণঘাটায় ঘুরতে বের হই। হরিণঘাটার প্রধান আকর্ষণ হরিণ। শোনা যায়, এই সময়টায় হরিণদের অবাধ বিচরণ দেখা যায়। আমরা একটা উঁচু ব্রিজের ওপর থেকে বন পর্যবেক্ষণ করছিলাম। চারদিকে সবুজের সমারোহ। বিচিত্র সব গাছ আর পাখির ডাক আমাদের মুগ্ধ করছিল।

আমি বরাবরই শান্তিপ্রিয় মানুষ। শহুরে কোলাহল থেকে দূরে থাকা নির্জন বনভূমি আমাকে টানে। সবুজের নিঃশ্বাসে মন ডুবে যায়, ক্লান্তি যেন মাটির গন্ধে হারিয়ে যায়। নিশ্চুপ বিকেলে পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো,

নরম বাতাস, আর চঞ্চল বন্ধুদের উচ্ছ্বাস-সবই যেন স্বপ্নের এক টুকরো আলো। শহরের দেয়ালে হারিয়ে যাওয়া

আমি, শ্যামল ছায়ায় যেন নতুন করে নিজেকে খুঁজে পাই।
হরিণঘাটার এমন নির্জন পরিবেশে আমি যেন আমাকেই খুঁজে পেয়েছিলাম। সব ক্লান্তি ভুলে হয়ে উঠেছিলাম এক চঞ্চল চড়ুই।
হরিণঘাটা থেকে ট্রলারে করে আমরা লালদিয়া সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিলাম। ট্রলারে বসে নদীর পাড় ঘেঁষে থাকা হরিণঘাটার সৌন্দর্য দেখছিলাম। কী সুন্দর সে বনাঞ্চল! নদী শেষ হয়ে যখন সমুদ্রে প্রবেশ করল, এত কাছ থেকে সমুদ্র দেখার বিস্ময় আমাদের চোখেমুখে লেপ্টে গেল। ট্রলার থেকে নামলাম লালদিয়া চরে।

প্রথমবারের মতো সমুদ্র দেখার আনন্দে আমি বিমোহিত! সমুদ্রের জলে পা ডুবানোর ইচ্ছেটা আর দমিয়ে রাখা সম্ভব হলো না। বালুকাবেলায় হাঁটতে হাঁটতে নেমে পড়লাম জলে। সমুদ্রের গর্জন, আছড়ে পড়া ঢেউ, আর নীল জলরাশি দেখে মনে হচ্ছিল, আমি যেন খোলা চুলে, চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এক সাগরকন্যা! লালদিয়া থেকে ফেরার সময় হয়ে এলো। সূর্য তখন অস্তাচলে। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম সে দৃশ্য।

হরিণঘাটা ফিরে আমরা দুপুরের খাবার খেয়েছিলাম, যদিও তখন সন্ধ্যা!
পিরোজপুরে ফেরার সময় হয়ে এল, কিন্তু মন তখনও পড়ে আছে সাগরপাড়ে। সবাই নিজেদের বাসে উঠল, বাস রওনা হলো পিরোজপুরের উদ্দেশ্যে।

আমাদের বিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন আরিফ স্যার। তিনি ভীষণ সুন্দর গান গাইতে পারেন। আমরা তার কাছে গান শোনানোর আবদার করেছিলাম। এরপর তিনিও গাইলেন, আমরাও গলা মেলালাম।

হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে আবার ফিরে এলাম চিরচেনা গন্তব্যে। আবার ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে জীবনের নিয়মে। শহুরে কোলাহল আবারও জীবনকে নির্জীব করে তুলবে। কিন্তু কোথাও না কোথাও শান্তির কারণ হয়ে থেকে যাবে এই অমলিন স্মৃতিগুলো!
তাই এই স্মৃতিগুলো জীবন্ত করে রাখতে লিখে ফেললাম "স্মৃতিকথা"।

টাকার রাজ্যে এক বিকেল

রহমতুল্লাহ শিহাব

"টাকা কি গাছে ধরে?"

এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন পাঠক, জানি না। তবে আমি দেখেছি টাকার গাছ। স্বপ্নে নয়, বাস্তবেই। সচক্ষে। অবাক লাগলেও অবিশ্বাসের কিছু নেই। রাজধানির মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা জদুঘরের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই প্রথমে দৃষ্টি আটকে যায় একটি ম্যুরালের উপর। ভবনের গায়ে কিছুটা গাছের মতো রূপ দেওয়া স্টিলের কাঠামো, তাতে সাজানো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের হরেকরকম মুদ্রার অনুলিপি। নিচের দিকে লেখা "টাকা গাছ"। ভালো লাগার মতো একটা শিল্প। একটু সামনে এগিয়ে দেখলাম টাকার কলসি। দেয়ালে লাগানো এই টাকার কলসির পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অঢেল টাকা। জাদুঘরে প্রবেশের পূর্বেই এত আয়োজন বেশ ভালো লাগল আমার। দ্রুত কাউন্টারে নাম-ঠিকানা এন্ট্রি করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলাম দ্বিতীয় তলায়। টাকা ছাড়াই প্রবেশ

করলাম টাকা জাদুঘরে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। টাকা জাদুঘরে ঢুকতে কোনো টাকা লাগে না। সবার জন্য উন্মুক্ত । ইতিপূর্বে সীমিত পরিসরে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটি কারেন্সি মিউজিয়াম ছিল। টাকা মিউজিয়ামটি আসলে তারই বর্ধিত এবং আধুনিক রূপ। পরিসর বড় করার পরিকল্পনা গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুরোধে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ দুষ্প্রাপ্য সব মুদ্রা এই জাদুঘরে দান করেন। কিছু মুদ্রা কেনাও হয়। ভালো লাগার বিষয় হলো কর্তৃপক্ষ দাতাগণকে বেশ কৃতজ্ঞতার সাথেই স্বরণীয় করে রেখেছেন। ২০১৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের প্রথম এই টাকা জাদুঘর।

কৌতূহলপূর্ণ বিকেল। জানার আগ্রহে হৃদয় উন্মুখ । দর্শনার্থীদের তেমন ভিড় নেই আজ। আমরা প্রবেশ করলাম ১নং গ্যালারিতে। ভেতরে ঢুকতেই থরে থরে সাজানো টাকা, পয়সা, মুদ্রাগুলো যেন স্বাগত জানাল আমাদের। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। মনে পড়ে, সবচে আকর্ষণীয় গ্যালারি ছিল এটা। এখানেই আড়াই হাজার বছর আগের রৌপ্য মুদ্রা থেকে শুরু করে বর্তমানে প্রচলিত কাগুজে টাকার বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে দারুন দক্ষতার সাথে। কিতাবের পাতায় দিনার দিরহামের কথা কতবার পড়েছি। কিন্তু দেখলাম ওখানে গিয়ে। মনে হলো, জ্ঞানীজন বলে থাকেন পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য শিক্ষাসফরের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । কথাটা ফেলনা নয়। দিল্লির সুলতান, মুঘল শাসক, বাংলার সুলতান থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসক ও বাংলার জমিদার পর্যন্ত যত জনের নাম পড়েছি ইতিহাসের পাতায়, প্রায় সবার যুগের মুদ্রা-কড়ি দেখলাম ওখানে। সবচেয়ে মোহনীয় ও চিত্তাকর্ষক ছিলো মুসলিম সুলতানগণের অপুর্ব শৈল্পিক কীর্তি। তাঁদের যুগের মুদ্রার পিঠে নিখুঁতভাবে আরবি, উর্দূ, ফার্সী হস্তাক্ষরে চিত্রিত করা আছে সারগর্ভ কালাম, তৎকালীন খলিফার নাম, মুদ্রা প্রচলনকারী সুলতানের নাম, মুদ্রা প্রচলনের সাল, শাসনকাল ইত্যাদি। ভীষণ ভালো লাগে আমার। এক মুঠো পুলক অনুভব করি হৃদয়ে। চমৎকার এই শিল্পের ভোজবাজি সময়ের প্রাচির ভেদ করে মুহূর্তেই আমাকে নিয়ে যায় সুদূর অতীতে। আমি যেন মূল্যনিয়ন্ত্রক শাসক আলাউদ্দিন খিলজীর যুগের একজন মমানুষ। শরীরে প্রাচিন পোষাক।

দুএক জায়গায় শেলাই করা। তালি লাগানো। ওদিকে আমার মন নেই। দুপুরে মাছ-ভাত খেয়ে শীতল পাটি

বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম আমগাছ তলায়।থেকে থেকে ঘুঘুর মায়াবী ডাক উদাস করে তোলে আমায়। ঝিরঝির বাতাস বয়ে যায়। তালে তালে দোলে পত্র-পল্লব। কী শান্তি! কী সুখ! এযুগের এয়ারকন্ডিশনেরর চেয়ে ঢের ঢের বেশী। দিবাকর উত্তাপ হারাতে শুরু করে। মনে পড়ে যায়, আজ তো হাটের দিন। দ্রুত খড়ম জোড়া পরি। হাতে একটা থলে নিয়ে বাজারের পথ ধরি। অনারম্বড় হাট। কেউ গাছের নিচে, কেউ রাস্তার পাশে ব্যবসাসামগ্রি নিয়ে বসেছে। দরাজ কণ্ঠে হাঁক ছাড়ছে।বিশ্বাসই হতে চায় না সবকিছু এত্ত সস্তা ! থলে ভরে বাজার করি। তারপর মাছ কিনি। মুরগি কিনি। দুধ কিনি। তবু যেন শেষ হয় না দুচারটে মুদ্রা। আরো থেকে যায়। তারপর মিষ্টি কিনতে দোকানে যাই। এখানেও সস্তা। রসগোল্লা কিনি।

মিষ্টি কিনি।টাকা শেষ হয় না। দোকানিকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ভাই, সবকিছু এত কম দামে বিক্রি করছেন কিভাবে? আপনারা কি তবে নিজেদের ব্যবসায় লোকসান সাধতে বসেছেন? লোকটা নিতান্ত সাদা মনের মানুষ। আমার অদ্ভুত প্রশ্নে সে ভীষণ অবাক হয়। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। হয়তো ভাবে, এই লোক আবার কোন জগৎ থেকে উঠে এলো । হঠাৎ সফরসঙ্গী মাহমুদের সম্বোধনে চমক ভাঙে আমার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে আসি শান্তিময় অতিত থেকে যন্ত্রণাদায়ক বর্তমানে। সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত দ্রব্যমূল্যের যুগ থেকে অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্ধারিত দ্রব্যমূল্যের যুগে।আনন্দঘন আচ্ছন্নতা কেটে যায়। বিভিন্ন ভয় ও শঙ্কার আঘাতে হৃদয়টা জর্জরিত হয়। ক্ষতবিক্ষত হয়।

এরপর দেখলাম প্রাচীনকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলায় ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত কড়ি। সেই সাথে চোখে পড়ে আমাদের দেশে অতীতে ব্যবহৃত পাঁচ পয়সা-দশ পয়সার কয়েন। চোখ সরাতে পারি না। অনিমিখ তাকিয়ে থাকি। হারিয়ে যাই দুরন্ত শৈশবে। শৈশবীয় স্মৃতির ক্যানভাসে। আমার দাদি। বিয়ের পর থেকেই একটা মাটির ব্যাংকে টাকা জমাতেন। পাঁচ পয়সা-দশ পয়সার একটা কয়েন পেলে পরম যত্নের সঙ্গে রেখে দিতেন ব্যাংকে। কিছুদিন পর হঠাৎ ব্যাংটা তার গায়েব হয়ে গেলো। বহু খোঁজা হলো। তবু পাওয়া গেল না। কোথাও না। তিনি আশাই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু কয়েনগুলো যখন বাজারে অচল ও মূল্যহীন তখন পাওয়া গেল ব্যাংটা। দাদির জামা-কাপড় রাখার বাক্সের এক কোণে। আমার তখন খেলাধুলার বয়স। তাই কিছু কয়েন দাদি রেখে দিলেন স্মৃতি হিসেবে আর

বাকীগুলো হল আমার খেলার উপকরন।

খানিকটা এগিয়ে দেখলাম পঁচিশ পয়সা, আটআনা ও হরিণের ছবি আঁকা এক টাকার নোট। এগুলো আজ অচল। জাদুঘরের শোভা বর্ধনে নিয়জিত। অথচ নির্মল শৈশবে আমাদেরর কাছে এগুলো ছিলো ভীষণ দামি সম্পদ। বড়রা এই টাকা দিয়ে অতি সহজেই আমাদেরকে কিনে দিতে পারতেন এক আকাশ আনন্দ। আমরা লাল পলিথিনে মোড়ানো চারটে চকোলেট পেতাম তখন এক টাকায়,পঞ্চাশ পয়সায় দুটো ও পঁচিশ পয়সায় পেতাম একটা। এখন সব শুধুই স্মৃতি।মনে হয় স্মৃতির যদি আকৃতি থাকত তাহলে আমাদের শৈশবীয় স্মৃতিগুলোও আজ জাদু ঘরে স্থান পেয়ে যেত।

একটু সামনে গিয়ে দেখলাম ফুটো পয়সা বা কানা কড়ি । বিভিন্ন গল্পের বইয়ে পড়েছি কানা কড়ির কথা। তখন মনে হত এগুলো কাল্পনিক।কিন্তু দাদি বলেছিলেন বাস্তব। তখন থেকেই খুব আগ্রহ জন্ম নিয়েছিলো এই কয়েনটা দেখার। ভালো লাগলো দেখে।

প্রথম গ্যালারিটা ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম তিনটি ডিওরামা। তাতে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে বাংলার হাজার বছরের বিনিময় প্রথা। দেখা যাচ্ছে, মানুষ ধানের বিনিময় হিসেবে নিচ্ছে গরু, চালের বিনিময়ে মুরগি। পরেরটায় নদীর তীরে এক হাটে বেচাকেনা হচ্ছে পাট, তারও পরেরটায় উঠে এসেছে মানুষের সঞ্চয়ের চিত্র। বিশেষ এই প্রদর্শনীর নাম ‘বিনিময়ের একাল-সেকাল’।

অন্য গ্যালারিগুলোও ঘুরলাম ধীরে ধীরে। দেখলাম পৃথিবীর প্রায় সব স্বাধীন দেশ, বিলুপ্ত দেশ ও বিলুপ্ত জনপদের ব্যাংক নোট ও ধাতব মুদ্রা। এত্ত টাকা দেখতে দেখতে ক্লান্তি এসে গেলো শরীরে । বিকেলটাও ফুরিয়ে যেতে লাগল। সন্ধা নেমে এলো প্রকৃতিতে। ভেসে এলো মধুমাখা আজানধ্বনি। আমরা দ্রুত বের হয়ে মসজিদের পথ ধরলাম।

বড়বাড়িয়া , চিতলমারী ,বাগেরহাট

স্মৃতিতে কক্সবাজার ট্যুর

সজীব মাহমুদ

সবার জীবনেই কিছু স্মৃতি থাকে, যা কখনো রঙিন, কখনো নস্টালজিক। মন খারাপের সময় সেই স্মৃতিগুলোর জানালা খুললেই মনে হয়-জীবন আসলে মন্দ নয়। সুখ-দুঃখের স্রোতে গা ভাসিয়েও কিছু মুহূর্ত চিরকাল হৃদয়ের গহিনে রয়ে যায়, ঠিক যেমন আমার কক্সবাজার ট্যুরের দিনগুলো।

প্রস্তুতি ও যাত্রা ২০১৬ সালে আমি বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের National Hotel & Tourism Training Institute (NHTTI) থেকে ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট সম্পন্ন করি। আমাদের কোর্সের তৃতীয় সেমিস্টারের অংশ হিসেবে একটি শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছিল, যার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এলো মে মাসের শেষ সপ্তাহে।

আমাদের ট্যুরের গন্তব্য ঠিক হলো বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। ডে ও ইভেনিং ব্যাচ মিলিয়ে প্রায় সত্তর জনের দল তৈরি হলো, আমাদের গার্ডিয়ান হিসেবে সঙ্গে ছিলেন প্রিয় দুই শিক্ষক মতিউর রহমান স্যার ও সাব্বির ভূঁইয়া স্যার। মতিউর রহমান স্যার অবসরের আগেই শেষবারের মতো আমাদের সঙ্গে এই ট্যুরে যাচ্ছিলেন, তাই তার জন্যও এটি বিশেষ এক সফর ছিল।

সকাল সাতটায় NHTTI-এর সামনে এসে পৌঁছাল দুটি বড় বাস। সবার চোখে উত্তেজনার ঝিলিক, আনন্দের উচ্ছ্বাস। আমার পাশের সিটে ছিল প্রিয় বন্ধু আনন্দ, আব্দুল্লাহ ও আকিদ। আমাদের যাত্রা শুরু হলো ঠিক নয়টায়। একটানা হৈ-হুল্লোড়, গানের আসর, গল্পের ফোয়ারায় কখন যে সময় কেটে যাচ্ছিল, বোঝার উপায় ছিল না।

দুপুরে আমরা লাঞ্চ বিরতিতে কুমিল্লায় থামলাম এবং কিছুক্ষণ পরিদর্শন করলাম ওয়ার সিমেট্রি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈন্যদের কবরস্থানটির নিস্তব্ধতা আমাদের এক অন্যরকম অনুভূতির মধ্যে ফেলে দিল। সবুজ ঘাসে মোড়া এই জায়গাটি যেন ইতিহাসের এক জীবন্ত অধ্যায়। কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে আবার রওনা দিলাম কক্সবাজারের পথে।

রাত প্রায় নয়টায় পৌঁছালাম আমাদের নির্ধারিত আবাসস্থল হোটেল শৈবাল-এ। দীর্ঘ ভ্রমণে সবারই চোখে ক্লান্তি। ডিনার শেষে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম, কারণ সামনে ছিল নতুন অভিজ্ঞতায় ভরা আরেকটি দিন।

হোটেল পরিদর্শন ও সমুদ্রস্নান

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে- শহুরে জীবনে যা একেবারেই বিরল। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম সূর্যোদয়, গায়ে এসে লাগল সোনালি রোদের পরশ। মনে হলো, এভাবেই যদি প্রতিটি সকাল শুরু হতো!

নাশতা সেরে আমরা বের হলাম কক্সবাজারের বিভিন্ন তারকা হোটেল পরিদর্শনে। মতিউর রহমান স্যার ও সাব্বির ভূঁইয়া স্যার আমাদের কক্স টুডে, সায়মান, ও ওশান প্যারাডাইসসহ বেশ কয়েকটি হোটেল ঘুরিয়ে দেখালেন। সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল

কক্স টুডে। তারকা খচিত এই হোটেলের আতিথেয়তা, ডিজাইন এবং ব্যবস্থাপনা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিল যখন জানলাম যে, এই হোটেলে কর্মরত বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা NHTTI-এর প্রাক্তন শিক্ষার্থী। তাদের গল্প শুনে আমরা অনুপ্রেরণা পেলাম, স্বপ্ন দেখলাম-একদিন আমরাও হয়তো এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করব।

দুপুরে ফিরে এসে লাঞ্চ সেরে নিলাম, বিকেলে আমাদের পরিকল্পনা ছিল সমুদ্রসৈকতে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলার। কক্সবাজারের উন্মুক্ত বাতাসে, সৈকতের সোনালি বালিতে ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতা সত্যিই অন্যরকম ! খেলার পরপরই সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, ক্লান্ত শরীর নিমিষেই সতেজ হয়ে উঠল।

সন্ধ্যার আগে সূর্যাস্ত দেখলাম অপলক দৃষ্টিতে। লাল-কমলা আভায় রঙিন হয়ে উঠল আকাশ, সাগরের গা বেয়ে নেমে আসা আলো যেন এক স্বপ্নময় মুহূর্ত তৈরি করল। ঠিক তখনই একটি ঝিনুক কুড়িয়ে নিলাম-স্মৃতি ধরে রাখার জন্য। "কোনো এক মন খারাপের সন্ধ্যায় এই ঝিনুকটা দেখব", মনে মনে ভাবলাম।

ইনানী বিচ ও হিমছড়ির মায়া

পরদিন আমাদের গন্তব্য ছিল ইনানী বিচ ও হিমছড়ি। বাসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম একপাশে পাহাড়, অন্য পাশে অনন্ত নীল সমুদ্র। এই রাস্তা যেন সৌন্দর্যের জাদুঘর ! কিছু সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়।

ইনানী বিচে পৌঁছানোর পর আমরা ঢেউয়ের ছন্দে হারিয়ে গেলাম। প্রকৃতির এই বিশালতা মনকে এক অনন্য প্রশান্তি দেয়। এরপর রওনা দিলাম হিমছড়ির জলপ্রপাত দেখতে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এক অন্যরকম অনুভূতি হলো-নীল আকাশ, সবুজ পাহাড়, নিচে গর্জনরত সমুদ্র। মনে হচ্ছিল, জীবনটা যদি এখানে থমকে যেত!

রাতে প্রবাল হোটেলে ফরমাল ডিনার ছিল আমাদের ট্যুরের অন্যতম আকর্ষণ। সবাই ফরমাল পোশাকে হাজির হলাম। খাবারের পাশাপাশি চলল আড্ডা, হালকা হাস্যরস। এরপর হোটেলে ফিরে ঘরোয়া সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজন করা হয়েছিল। কৌতুক, গান, নাচ, অভিনয়ে মুখর হয়ে উঠেছিল রাত। বন্ধু তারিকুলের অভিনয় দেখে সবাই হেসে কেঁদে ফেলেছিল প্রায় !

বিদায়ের বিষণ্ণতা

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে হলো-এ যেন বিষাদময় সকাল। সব শেষ হয়ে যাচ্ছে! চার দিন আগে যাত্রা শুরু করেছিলাম একসঙ্গে, কিন্তু এই মুহূর্তের পর থেকে সবাই যার যার পথে হাঁটবে।

বাসে উঠে চুপচাপ জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। পাশে বসা আনন্দ বলল, " সাগরের ধারে জেলেদের ছোট ছোট কুটিরগুলো দেখেছ ? ওদের তেমন কিছু নেই, কিন্তু তবুও তারা সুখী। কারণ তারা প্রকৃতির সঙ্গে থাকে, নীল আকাশ আর সমুদ্রের ঢেউ দেখে দিন শুরু করে। আমরা শহরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি। প্রকৃতির এত সৌন্দর্য থাকার পরও আমরা সুখ খুঁজি কংক্রিটের জঙ্গলে !"

আনন্দের কথা শুনে আমিও ভাবনায় ডুবে গেলাম। সত্যিই তো, শহুরে জীবনের দৌড়ঝাঁপে প্রকৃত সুখ খুঁজে পাই না আমরা । ঢাকা ফেরার পথেও ছিল হৈ-হুল্লোড়, গানের আসর, প্রাণখোলা হাসি। কিন্তু সবার মনে একটাই প্রশ্ন-এই স্মৃতির মতো মুহূর্ত কি আর কখনো ফিরে আসবে?

বহু দিন পেরিয়ে গেছে সেই ট্যুরের, তবু কক্সবাজারের ঢেউ যেন এখনও মনে ডাক দেয়। একদিন আনন্দ ফোন দিয়ে বলল, " চল, আবার ইনানী বিচে যাই। এবার সত্যি সত্যি জেলেদের কুটিরে একটা রাত কাটাই! "

আমি জানি , হয়তো খুব শিগগিরই আমরা আবার ফিরব, প্রকৃতির মাঝে সুখ খুঁজতে। আমাকে যেতেই হবে। আবারও হারিয়ে যাব সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে, সূর্যাস্তের রঙে, পাহাড়ের সবুজে। এখন মনটা বড্ড অশান্ত। প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরশ মনে ছুঁয়ানো ভীষণ দরকার। নি:শব্দে সমুদ্র আমাকে ডাকছে ভীষণ। সে মায়াবী ডাক আগ্রাহ্য করার সাধ্য আমার নেই।

ভালো থাকুক কক্সবাজার, ভালো থাকুক সে দিনের সব স্মৃতি, ভালো থাকুক আমার বন্ধুদের মন। আমরা আবার ফিরব !

সুনামগঞ্জ, সিলেট

(ভৌতিক গল্প)

দারিংবাড়ির রহস্যময়ী

শংকর ব্রহ্ম

ট্রেন চার ঘণ্টা লেট, হাওড়া স্টেশনের মেঝেতে কাপড়, চাদর কিংবা কাগজ বিছিয়ে নীরবে ঘুমের দেশে অনেক যাত্রীরা, আমরা ক'জন যাত্রী জেগে আছি, ঘুম নেই চোখে।

ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল রাত ১১-৫৫ মিনিটে
সে ভাবেই প্রস্তুত হয়ে রাত দশটায় এসেছিলাম স্টেশনে, এসে শুনি দু'ঘণ্টা ট্রেন লেট, সেই দুঃসংবাদ মেনে নিয়ে, মনে মনে অপেক্ষার শুরু হয়। এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার ঘোষণা হলো, ট্রেন ছাড়বে ৩-৫৫ মিনিটে, আমদের যে ট্রেনটায় (হাওড়া চেন্নাই মেল) যাওয়ার কথা ছিল, সেই ট্রেনটাই নাকি চেন্নাই থেকে ছেড়ে হাওড়া আসার পথে বিশাখাপত্তনে অ্যাক্সিডেন্ট করছে, লোকে বলাবলি করছিল, শুনলাম। সেটা এখনও হাওড়ায় ফিরে আসেনি। সেই ট্রেনটা হাওড়ায় ফিরে এলে, তারপর আমাদের নিয়ে সেই ট্রেনটাই আবার ছাড়ার কথা হাওড়া থেকে। জানি না কী হবে শেষপর্যন্ত। কী আর করা যাবে? কখন আসবে ট্রেন, বিনিদ্র রাত অপেক্ষায় থাকি তার? শেষপর্যন্ত ট্রেন বাতিল হবে কি না তাও জানা নেই।

ট্রেন হাওড়ায় এলো রাত তিনটায়। ২৩ নং প্ল্যাটফরমে দিয়েছে ট্রেনটা। সেখান থেকেই ছাড়বে সেটা ৩-৫৫ মিনিটে। তিনটায় ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছেছে, ৩ - ৩০ মিনিটে ২৩ নম্বর প্ল্যাটফরমে ট্রেন দিয়েছে। আমরা আছি ৭ নং- ওল্ড প্ল্যাটফরমে, ২৩ নম্বরে এখন যেতে হবে আমাদের নিউ প্ল্যাটফরমে। এখন এখান থেকে হেঁটে যেতেই ১৫-২০ মিনিট লাগবে। ট্রেন ছাড়বে ৩-৫৫ তে।
ঘুম ঘুম চোখে এলোমেলো পা ফেলে সেদিকেই হাঁটছি। কপালে দুর্ভোগ থাকলে, কী আর করা?

ট্রেন ঠিক ৩-৫৫ মিনিটেই ছাড়ল। ট্রেনে উঠে, মালপত্র রেখে গুছিয়ে রেখে, বিস্কুট আর সন্দেশ খেয়ে, জল পান করে শুয়ে পড়লাম। আধো ঘুম আধো জাগরণে কাটল, দেখতে সুন্দরী অচেনা এক তরুণীর সঙ্গে স্বপ্নে কাটল, তার হাত ধরে দাড়িংবাড়ির টিলায় টিলায় ঘুরে বেড়ালাম। দেখলাম, নিবিড় শালের বন, খাঁড়া নেমে গেছে, টিলার গা বেয়ে নিচের দিকে। আঁকাবাঁকা বাঁক ঘুরে অনেক দূর চলে গেলাম তার হাত ধরে মোহগ্রস্তের মতো একটা ঘোরে। তরুণীর মুখটা কেমন ছিল দেখতে? মনে করতে পারলাম না। স্বপ্নটা দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। সকালের উজ্জ্বল রোদে ভরে গেল বাইরে সবুজের প্রান্তর। সবুজ মাঠে রোদের আলো ঝলমল করছিল।

দেখতে দেখতে সাড়ে দশটার মধ্যে ট্রেনটা ভদ্রকে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। তার আগেই ঘুম থেকে উঠে, বাথরুমে গিয়ে প্রাত্যহিক কর্ম সেরে নিলাম। তারপর আমার সকালের টিফিন (কেক,কলা, ডিম সিদ্ধ, ম্যাঙ্গো জুস দিয়ে) ভদ্রকে সারলাম।

১১-৪৫ মিনিটে মহানদী পেরোলাম। যেখানে হীরাকুঁদ বাধ আছে। কী বিশাল নদী, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না, প্রায় সমুদ্রের মতো দেখতে, পার্থক্যের মধ্যে শুধু সমুদ্রের মতো ঢেউ নেই তাতে।

দেখত দেখতে কটক স্টেশন চলে এলো। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াল ট্রেন। স্টেশনে নেমে বড় মাটির ভাড়ে

চমৎকার স্বাদের কফি খেলাম, মাত্র পনেরো টাকা করে দাম। তারপর ট্রেন আবার চলতে শুরু করল উড়িষ্যার রাজধানী ভূবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে।

ভূবনেশ্বর পৌঁছে সেখানে ট্রেন দশ-পনেরো মিনিট থামল। তারপরে আবার ট্রেন চলতে শুরু করল। ১-৪০ মিনিটে এসে থামল খুরদা রোড স্টেশনে। সেখানেও থেমে দাঁড়িয়ে থাকল দশ-পনেরো মিনিট। দু-চারজন যাত্রী উঠল-নামলো। আবার ট্রেন টলতে শুরু করল।

তারপর এমন ধীরগতিতে চলতে শুরু করল, সামনে সিগন্যাল না পেয়ে যে মোট এগারো ঘণ্টা লেটে এসে ট্রেন পৌঁছাল ব্রক্ষ্মপুর।

এটা দারিংবাড়িতেই অবস্থিত। হাওড়া চেন্নাই মেলে দারিংবাড়ি বেড়াতে এসেছি। ট্রেন এগারো ঘণ্টা লেট থাকর কারণ, যেখানে সকাল আটটায় পৌঁছাবার কথা ছিল, পৌঁছেছি রাত নয়টায়। এসে সামনে সুন্দর একটা হোটেল দেখতে পেয়ে সেখানে এসে উঠলাম। রুম নাম্বার তেরো। এখানে খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। ভাবলাম লাগেজটা রুমে রেখে, বাইরে থেকে কিছু খেয়ে আসব। দরজায় লক করে বের হলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। তাই ব্যর্থ মনে আবার ঘরে ফিরে এসে দেখলাম, দরজা খোলা। দরজা খোলা দেখে আমি তো অবাক। ভাবলাম, তাহলে কি দরজায়, লক করব ভেবে, ভুল করে, লক না করেই বেরিয়ে গেছি?

ঘরে ঢুকে বিস্ময়ে আমি আরও হতবাক। এক তরুণী সুন্দরী টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখে বলল, আসুন খেয়ে নিন। ট্রেনে তো কিছুই পেটে পড়েনি।

আমি হেসে বললাম, সত্যিই তাই।

খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসলাম। ভাবলাম, হোটেলের কোন কাজের মেয়ে হবে এই তরুণী। তাই আর কথা না বাড়িয়ে উদরপূর্তির কাজে মগ্ন হয়ে গেলাম।

সরু চালের সফেদ ভাত, ঘনকরে মুসুর ডাল, আর আলুপোস্ত। সামান্য এই খাবার তখন আমার কাছে অমৃত স্বাদের মতো মনে হচ্ছিল। তরুণী ঘর থেকে ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া সেরে, থালা বাতি নিচে নামিয়ে রেখে, বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলাম। হাত মুখটা টাওয়েল দিয়ে মুছে নিলাম। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বসে, তৃপ্তি করে ভরা পেটে কয়েকটা সুখ টান দিয়ে, সিগ্রেট এস্ট্রেতে গুঁজে দিয়ে, জামা কাপড় চেঞ্জ করে, রুম ভেতর থেকে লক করে, বিছানায় গা এলিয়ে

দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাইনি।

ঘুম ভাঙল সকাল আটটায়। দেখলাম রুম খোলা। দরজা দিয়ে সকালের আলো এসে ঘরে ঢুকছে। নিচে নামিয়ে রাখা গতকাল রাতের খাবার থালা বাটি পড়ে নেই। রুম খোলা দেখে ভাবলাম, ডুবিকেট চাবি নিশ্চয়ই, হোটেল-অলার কাছে আছে, না হলে রুম আমি লক করে দেওয়ার পরও কী ভাবে খুলে থালা-বাটি নিয়ে গেল ওরা?

যাই হোক। এখানে থেকে আজ আমি 'লাভারট পয়েন্ট' দেখতে যাব। সেখানে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া ঝরনার জল এসে, নেচে নেচে পাথরের উপর দিয়ে বয়ে যায় অবিরত। অপূর্ব দৃশ্য। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

তাই দেখতে যাব বলে আর দেরি না করে, বাথরুমের প্রাত্যহিক কাজকর্ম সম্পন্ন করে, আমার লাগেজ গুছিয়ে, নিজেকে দ্রুত প্রস্তুত করে নিলাম। বেরিয়ে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে সেখানে যেতে হবে।

নিচে কাউন্টারে এসে আমার পেমেন্ট করতে গিয়ে জানলাম, রাতে ওরা আমাকে কোন খাবার পাঠায়নি। তাহলে খাবার পাঠাল কে আমায়? আর ওই তরুণীই বা কে?

একপলক দেখলেও, তরুণীর মুখটা আমার চোখের লেন্সে ধরা ছিল নিখুঁত ভাবে। হোটেলে আর কথা না বাড়িয়ে, মনে একটা দুর্বোধ্য খটকা নিয়ে, হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে, ছোট একটা জিপ গাড়ি ভাড়া করে 'লাভারট পয়েন্ট'-য়ে উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আধ ঘণ্টা পরে সেখানে এসে পৌঁছালাম। সেখানে এসে দেখলাম, একটা পাথরের উপর বসে সেই তরুণী, অন্য মনস্কভাবে জলের ভেতর পা দু'টি ডুবিয়ে দোলাচ্ছে। পা দু'টি দেখে আমার হাড় হিম হয়ে গেল। পা দু'টির গোড়ালি সামনের দিকে, আর আঙুলগুলো গোড়ালির দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে তরুণী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। চোখের ইশারায় তার পাশে গিয়ে বসার ইঙ্গিত করল। আমিও মন্ত্র মুগ্ধের মতো মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তার পাশে গিয়ে বিমূঢ়ভাবে বসলাম।

একটু পরে সেই তরুণী জলে পড়ে গিয়ে স্রোতের তোড়ে, পাথরে আঘাত খেতে খেতে সামনের দিকে ভেসে যেতে লাগল। আমিও তাকে বাঁচাতে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে স্রোতের তোড়ে ভেসে পাথরে আঘাত খেতে খেতে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। কতক্ষণ এভাবে আমি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে ছিলাম, জানি না। স্থানীয় একজন কাঠুরিয়া আমাকে পাহাড়ের একটা খাঁচে আটকে পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করেছিল যখন, তখন আমার কোন জ্ঞান ছিল না। আমার জ্ঞান

ফিরলে, আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, তরুণীটির কথা।
সেই তরুণীটির কি হল?
সে কথা শুনে, সে অবাক হয়ে আমার কাছে জানতে চাইল, কোন তরুণী?
আমার আগে যে তরুণীকে স্রোতের তোড়ে সামনের দিকে ভেসে যাচ্ছিল?
সে আমার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, না সে কোন তরুণীকে ভেসে যেতে দেখেনি কিংবা পাহাড়ের খাঁচে তাকে আটকে থাকতে দেখেনি। তার কথা শুনে আমিও কম অবাক হয়নি।
তরুণীটি কে? কেন সে কয়েক মুহূর্ত আমায় দেখা দিয়ে, আমার জীবন থেকে চিরতরে কোথায় হারিয়ে গেল। আজও আমি সেই রহস্যের কোন সমাধান করতে পারিনি।

অমৃত পথের পথিক

সুদীপ দাশ

এবার আমাদের যাত্রা অমৃতসর, ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশের এক ঐতিহাসিক শহর। এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন ১৫৭৪ সালে চতুর্থ শিখ ধর্মের গুরু রামদাস। সেই সময় এই জায়গা ছিল ঝোপ জঙ্গলে আর অনেকগুলো সরোবর অধ্যুষিত। পরবর্তী কালে নবম শিখ গুরু অর্জন দেব এই সররোরের উপর একটি দ্বীপে একটি মন্দির তৈরি করেন, যার নামে হরমন্দির সাহেব। শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গুরুগ্রন্থ সাহেব এইখানে রক্ষিত আছে। এই মন্দিরের গায়ে তামার পাত দিয়ে তার ওপর সোনার মোড়ক লাগানো হয়েছে। তাই এই মন্দির অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির নামে খ্যাত।

এই সবতো ছিল আমাদের ছোট বেলার ইতিহাস বইয়ের বর্ণনা। আজ এই

প্রৌঢ়ত্বে প্রান্তে পৌঁছে সেই অমৃতসরই টেনে নিয়ে এল আমায়।

অমৃতসর , যা কথ্য ভাষায় অম্বরসার নামে পরিচিত এবং ঐতিহাসিকভাবে রামদাসপুর নামে পরিচিত, ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে অবস্থিত। এর নামকরণ হয়েছে অমৃত সরোবর থেকে, যা গুরু রামদাস তুং গ্রামে নির্মাণ করেছিলেন। গুরু রামদাস বিশ্বাস করতেন যে, হ্রদের জলে আরোগ্য ক্ষমতা রয়েছে। তিনি মাত্র ৭০০ টাকায় জমিটি কিনেছিলেন এবং এর চারপাশে একটি মন্দির কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে, গ্রামটি বিকশিত হয় এবং চক রামদাস নামে পরিচিত হয় যা অবশেষে অমৃতসর হয়ে ওঠে যার আক্ষরিক অর্থ অমৃতের পুকুর। অমৃতসর হল শিখদের হৃদয় ও আত্মা এবং শিখ ধর্মের বৃহত্তম আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

স্বর্ণমন্দির , যা শ্রী হরমন্দির সাহেব নামেও পরিচিত, শিখ ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। এটি সারা বিশ্ব থেকে প্রচুর সংখ্যক পর্যটককে আকর্ষণ করে। গুরু রামদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং গুরু অর্জনদেব কর্তৃক সম্পন্ন, এটি ভারতের অন্যতম পবিত্রতম উপাসনালয়। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পবিত্র হ্রদ - অমৃত সরোবর। স্বর্ণ মন্দিরের তাৎপর্য এই কারণে যে, এখানে 'গুরু গ্রন্থ সাহেব'-এর প্রথম সংস্করণ স্থাপন করা হয়েছিল, যা শিখ ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। গুরু অর্জনের অনুরোধে অমৃতসরে স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন লাহোরের মুসলমান সুফি সাধক মিঞা মির। ছয় হাজার কবিতার সংকলন যে ' গ্রন্থসাহেব ' শিখদের সর্বপবিত্র, তাতে শিখ গুরুদের সঙ্গে সংকলিত হয়েছেন নামদেব, কবীর,ফরিদ, মীরাবাই,অন্ধ কবি সুরদাস , এমনকি বাঙলার পদকার জয়দেবও। নবম শিখ গুরু শিখ ধর্মের প্রচারে আগ্রা, এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা হয়ে আসেন ঢাকা। সেখান থেকে চলে যান সিলেট, চট্টগ্রাম হয় সন্দ্বীপ পর্যন্ত।।

শিখদের দশম গুরু, গুরু গোবিন্দ সিং বৈশাখী তিথিতে 'খালসাপন্থ' (যা বিশ্বব্যাপী শিখ ধর্মের ধর্মীয় সম্প্রদায়) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে বৃহৎ পরিসরে বৈশাখী উদযাপন করা হয় এবং এটি একটি বড় অনুষ্ঠান। মন্দিরের কেন্দ্রে অবস্থিত পবিত্র হ্রদটি তার ঔষধি গুণাবলীর জন্য জনপ্রিয় এবং এটি বিভিন্ন রোগ নিরাময় করে বলে বিশ্বাস করা হয়। আমরা একদিন সকালে একটি টোটো গাড়ি চেপে স্বর্ণমন্দির পৌঁছে গেলাম পিছনের দিকের পাপড়ওয়ালা গলি দিয়ে। এদিক দিয়ে ঢুকে সামনেই হরমন্দির সাহেব, অকাল তখন দেখলাম। এই সেই অকাল তখত যেখানে ১৯৮৪ সালে ভারতের সেনাবাহিনীর অপারেশন ব্লুস্টার নামে

এক অভিযানে অসংখ্য শিখ ধর্মপ্রাণ মানুষের মৃত্যু হয় এবং ধর্মীয় সৌধটি ধ্বংস হয়। পরে শিখ ধর্মের মানুষের স্বেচ্ছা শ্রমদানের মাধ্যমে এই সৌধটির পুনর্নির্মাণ করা হয়। এখানে দেখলাম যেন ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সেই সৌধের মধ্যে ঢুকে শত শত শহীদের ছবি দেখে মনটা যেন কেমন উদাস হয়ে গেল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হল অমৃতসরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান যা এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের জন্য কুখ্যাত। ভারত এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতার পূর্বে ১৯১৯ সালে, জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এই উদ্যানে ভারতীয়দের এক বিশাল সমাবেশে গুলি চালিয়ে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করা হয়। কিছু গুলির চিহ্ন এখনও দেয়ালে এবং সেই সাথে কূপও দৃশ্যমান, যেখানে শত শত মানুষ গুলি থেকে বাঁচার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানে তাদের হত্যা করা হয়। আজ এলাকাটি একটি সুন্দরভাবে কাটা, সুসজ্জিত পার্কে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে গণহত্যার জন্য একটি বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। এখানে নিহতদের স্মরণে সর্বদা একটি অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করা হয়। এই মিউজিয়ামটি সত্যি অতুলনীয়। সেই গুলির আজও যেন স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প বলে যাচ্ছে। এক সকালে আমাদের জালিয়ানওয়ালা বাগ দেখার পর পাঞ্জাবের বিখ্যাত ফুলকারি স্টীচে সমৃদ্ধ নারী পরিধেয় সংগ্রহ করার সুযোগ হলো।

এবার এক বিকেলে যাত্রা করলাম আঠেরো কিমি দূরে অবস্থিত ওয়াগা সীমান্ত যা হল ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্ত ফটক। প্রতি সন্ধ্যায়, বিটিং রিট্রিট নামে পরিচিত একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় যা ভারত ও পাকিস্তান উভয় সৈন্যের শক্তি প্রদর্শন করে এখানে উভয় দেশের সামরিক বাহিনীর এক এক জমকালো কুচকাওয়াজের মাধ্যমে । সূর্যাস্তের সাথে সাথে সীমান্তের ফটকগুলি খুলে দেওয়া হয় এবং উভয় দেশের পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। এরপর উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে করমর্দন অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা ভাঁজ করা এবং ফটক বন্ধ করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। এই উৎসাহী অনুষ্ঠানটি আপনার হৃদয়ে দেশপ্রেমের একটি ইতিবাচক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। যদিও দেশপ্রেমের এক বিরাট প্রদর্শনী হয়

এখানে, কিন্তু আমার কেন জানিনা এতো আস্ফালন তেমন আকর্ষণ করলো না।

কেন্দ্রীয় শিখ জাদুঘর শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত শিখ ইতিহাস প্রদর্শন করে। স্বর্ণ মন্দির কমপ্লেক্সে অবস্থিত, এটি শিখ গুরু, যোদ্ধা, সাধু এবং নেতাদের অসংখ্য চিত্রকর্মের আবাসস্থল। এখানে প্রাচীন মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি এবং প্রাচীনকালের অস্ত্রের সংগ্রহ রয়েছে; গুরু গোবিন্দ সিংহের কাঠের চিরুনি ছাড়াও। জাদুঘরটিতে একটি দুর্দান্ত গ্রন্থাগারও রয়েছে।

পার্টিশন মিউজিয়াম :

এবার অমৃতসরে এসে এই বিশেষ সংগ্রহালয়টি দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। এটি একটি ২০১৭ সালে উদ্বোধন হওয়া ঝকঝকে নতুন মিউজিয়াম। যেখানে ১৯৪৭ এর দেশভাগের ইতিহাস, তার প্রামাণ্য দলিল, বিভিন্ন সরকারি দস্তাবেজের নকল, বিভিন্ন বেতার সম্প্রচারের নমুনা, বিভিন্ন সংবাদপত্রের কাটিং, ছবি, দেশভাগ সম্বন্ধীয় চিত্রকলা, পোর্‌ট্রেট, সরকারি বেসরকারি যোগাযোগের নথিপত্র, সে যুগের উপদ্রুত পরিবারের ব্যবহৃত বাসনপত্র , তৈজসপত্র, কাঁথা, কম্বল, আসবাব, ব্যবহৃত পরিধেয় দিয়ে গ্যালারিগুলো সাজানো হয়েছে।

কংগ্রেস, মুসলিম লীগের বিবাদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বড়ো বড়ো ছবি প্রামাণ্য দলিল সহযোগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বেশ কয়েকটি গ্যালারিতে। দেশভাগের আগে ও পরের লাহোর , অমৃতসর, পাঞ্জাবে তার প্রভাব, সাহিত্য,শিল্পকলা, বাণিজ্য, চলচ্চিত্র , ক্রীড়া, রাজনীতি, অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া–এসব অত্যন্ত সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে।

একটি বিশেষ গ্যালারি শুধু পার্টিশনের নারীসমাজের ওপর কেমন প্রভাব পড়েছিল ,তা অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম, পোর্‌ট্রেটে সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

শুধু কি তাই? গ্যালারিগুলোতে ব্যবহার করা আলো, সুইচ বোর্ড–সবই দেশভাগের যুগের সামঞ্জস্য রেখে করা। একটি সুভেনির শপ রয়েছে যেখানে পার্টিশনের সম্পর্কের বিভিন্ন স্মারক, কার্ডের সাথে রয়েছে সে যুগের ব্যবহৃত বাসন, তৈজসপত্রের রেপ্লিকা রয়েছে বর্তমান ডিনার সেট এর আদলে,দর্শকদের সংগ্রহের জন্য।

পুরো সংগ্রহালয়ে ছেয়ে রয়েছে শুধু লাহোর, অমৃতসর এবং পাঞ্জাব। যেহেতু

এটি পার্টিশন মিউজিয়াম,তাই 'আমার সোনার বাংলা গানের আবহ সঙ্গীত' এর সাথে আমাদের বঙ্গের কিছু মানুষের দেশত্যাগের বিবরণলিপি, স্মারক আর নোয়াখালী দাঙ্গা, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এর কিছু পেপার কাটিং , ছবি দিয়ে বাংলা ভাগের প্রতি দায় সেরেছেন কর্তৃপক্ষ।

আমি এই পার্টিশনে প্রভাবিত এক পরিবারের সন্তান। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে লাখে, লাখে এমন পরিবার ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের অনেকেরই বাড়িতে বাড়িতে ছড়িয়ে রয়েছে সে যুগের ট্রাঙ্ক, বাসনপত্র, তৈজসপত্র, নকশিকাঁথা, দলিল দস্তাবেজের অবশিষ্ট–এমনকি ফেলে আসা জমির পরচা আরও কত কী? যা দিয়ে একটি অসামান্য সংগ্রহালয় এই বাংলায়ও অবশ্যই করার কথা ভাবা যায়।

এই অমৃতসর ভ্রমণের প্রাপ্তি কী জানেন? ইতিহাসের পাতায় পড়া শিখ ধর্মের বিবর্তন, সেই জাতপাত হীন, সংস্কারবর্জিত, অপৌত্তলিক, উদার সমন্বয়বাদী ধর্ম থেকে খালসা পন্থ , পঞ্জাবের যুগ যুগ ধরে চলমান উত্থান পতনের ধারাবাহিকতাকে চাক্ষুষ করা, যার দুই মেরুতে রয়েছে একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর হত্যা আর অপর মেরুতে রয়েছে তার প্রতিশোধে কয়েক হাজার শিখ ধর্মাবলম্বীর নিধনযজ্ঞ। আমার এই ভ্রমণে তাই ইতিহাস ছুঁয়ে যেন অসম্ভব এক বিষাদময় অনুভূতি হলো।।

বাঁশদ্রোণী , কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ , ভারতবর্ষ

স্মৃতির ফ্রেমে ভ্রমণ

আলমগীর হোসাইন

প্রকৃতির অপরূপ মায়াবী সাজ, বৃষ্টির পরশ
দেখার জন্য মনটা সদা উদাসীন থাকে,
গ্রামের মেঠোপথ দূর্বাঘাসের মৃদু পরশে
অবিরাম হেঁটে চলা কিংবা সবুজে হারানো।

শহরের অলিগলিতে ল্যাম্পপোস্টের আলোয়
অবারিত স্বপ্ন এঁকে চলা যায় বারংবার,
দেশের তেপান্তর ঘুরে বেড়ানো আর জানা
তা যেন একেকটা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা।

নদীর কলতান শুনা, পুরনো প্রাসাদ ভ্রমণ করা
অনন্য স্থাপনা, পার্ক, পশুপাখি দেখা ভালোলাগে,
আমি তো হাড়িয়ে ফেলি নিজেকে সবুজ মাঠে
কখন পাহাড়ের চুড়ায়, কিংবা মেঘের রাজ্যে।

মনে হয় প্রতিটি সকাল যেন ভ্রমণের নতুন গল্প
সেই গল্প লেখতেই যেন হারিয়ে যাই অনন্ত পথে,
ভ্রমণ পথে বেজে ওঠে প্রেম, বিরহ, আবেগের গান
বন্ধুদের সাথে আবদ্ধ হই হাজারো স্মৃতির ফ্রেমে।

কখনো কখনো হারিয়ে যাই ভ্রমণের অজানা পথে
ভাবতে ভাবতে আবার ফিরি নতুন ভাবনায়,
প্রতিটি ভ্রমণ যেন চারা রূপে গড়ে ওঠে সাহিত্যে
যেন একেকটা স্থান ভ্রমণ একেকটা বীজের মত।

সমুদ্রের তীরে একদিন

আমিনুল ইসলাম সৈকত

বহুদিনের লালিত স্বপ্নের সমুদ্র দেখতে এলাম,
চোখ জুড়ানো দিগন্ত বিস্তৃত মনোরম সমূদ্র।
বালির বুকে নীল দর্পণের মতো স্বচ্ছ জলরাশি,
ছন্দের তালে তালে বাজাচ্ছে সুমধুর মৃদু ধ্বনি।
উত্তাল ঢেউয়ের শুভ্রফেনা আছড়ে পড়ছে তীরে,
আহা,যেন হারালাম নিজেকে সৌন্দর্যের ভীড়ে।
আমি আগে কখনো এমন বৃহৎ সমুদ্র দেখিনি।
তবু যখন দেখা পেলাম, মননে জেগে উঠলো
ভীষণ অনুরাগ, হেন উষ্ম আদর মাখা উন্মত্ততা,
স্বপন দোলা মনে বাচন থেকে বের হলো প্রেমমন্ত্র।
আমি যখন পৌঁছুলুম তখন সকাল, ঠান্ডা হাওয়া,
মুহূর্তে সমুদ্রের বুক চিরে বৃহৎ রবির উদয় ঘটলো।
রক্তাক্ত লাল,যেন গগনের আলিঙ্গনে আছে বাঁধা,
সমুদ্রের উপকূলে একটি ঝাউবন দেখতে পেলাম।
দুলছে ঝাউপাতা,আদর মেখেছে গায়ে বনলতা।
আমার চতুর্দিকে চিক চিক করছে উষ্ণ রোদ,
প্রবলস্রোতে সম্মুখে নোঙর করলো রূপালি ঝিনুক।
তীরে বালু মাটির পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম,
হঠাৎ সাগরের জলে শব্দ উঠলো কতক ডলফিনের,
অস্থির সবে স্থিরহয়ে কেবল শুন্যতা দেখতে পেলো।
আমি হাওয়া খেতেখেতে স্বপ্নগুলো ভাবতে লাগলাম,
মাথার উপরে শো করে এরোপ্লেন উড়ে গেল দক্ষিণে।
তপ্তরোদে হাঁটতে হাঁটতে কিছু গর্ত দেখতে পেলাম।
আমাকে দেখে গর্তে লুকালো লাল কাঁকড়ার দল,
খুব চতুর প্রাণীগুলো, শিকারের খোঁজে বাসা বেঁধেছে।
দূরের একটি মরীচিকা দেখে থমকে দাঁড়ালাম,
আবিষ্কার করলাম গোটা দশেক নারিকেল গাছ।
চিকচিক বালির উপর দাড়িয়ে হাওয়ায় দুলছে।
একটি মৃতপ্রায় কুকুর,বিকেলে আমার পিছু নিলো।
খুব মায়া হলো,ফুটপাত থেকে খাবার কিনে দিয়েছি।
কুকুরটি লেজ নেড়ে আমাকে অভিবাদন জানলো।
বেলা যেতে যেতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো,হে সমুদ্র,
গোধুলির মতো আমাকেও বিদায় জানাতে হলো।
ওহে সমুদ্র তোমার ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ হয়ে,
প্রাণের সব দুঃখ ভুলে মায়ায় বন্ধী হয়ে গেলাম।
গগনের নীল তোমার ঔ নীল সবই মধুর লাগে।
তোমার নির্মল হিমেল হাওয়ার দিকে তাকিয়ে,
হৃদয়ের সকল অব্যক্ত কথা তোমাকে জানালাম।
কথাগুলো মনে গেঁথো,আবার দেখা হবে একদিন।
তোমার এ রুপ মাধুর্য্য,স্মৃতি হয়ে থাকবে অমনিল।

মেঘের খেলা

মোহাম্মদ হিজবুল্লাহ

পথের মাঝে হারিয়ে যাই, স্বপ্নের পিছু পিছু,
স্মৃতিরা ফিরে আসে, সোনালী রঙের রেশে।
পাহাড়ে চূড়ায় উঠি, মনে এক আশা,
নদীর স্রোতে ভাসে মন, শান্তির সাথে আশা।

আকাশে মেঘের খেলা, সূর্যের সোনালী আঁচল,
বাতাসে ভাসে পুরনো কথা, মধুর সুরের গুঞ্জন।
প্রকৃতির কোলে শান্তি, এক অমলিন সুর,
হারানো দুঃখও শান্তিতে রূপ নেয়, মধুর সে দূর।

পথ চলে যায় দূরে, গন্তব্য অজানা,
অন্ধকারে আলোর শিখা, সাথী হয়ে যায় পাসে।
নতুন দিনের আলো ফোটে, সাহসী এক আগমন,
যতই চলে যাই দূরে, শান্তি থাকে সঙ্গী মন।

পৃথিবী এক খোলা বই, পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা নতুন আশা,
কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো বিষণ্নতায় ভরা।
তবে প্রতিটি মুহূর্তে খুঁজি নতুন আলোর রেশ,
যা জীবনের পথে আসে, এনে দেয় এক নতুন আশ।

এভাবেই চলে যায় পথ, শান্তির সাথে চলে,
নতুন চমক, নতুন অনুভূতি, এক নতুন দিন ফুলে।
হৃদয়ের কোণে বপন হয় অজানা সুখের বীজ,
এ পথ চলতে থাকে, শেষ হবে না, অগণিত সাঁইজ।

এই পথের প্রতিটি বাঁকে, হারিয়ে যাই আবেগে,
ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে, শান্তি আর স্নেহে গড়ে।
পথটা কখনো সরল, কখনো জটিল, কখনো আঁধারে,
তবে সেখানেই খুঁজে পাই, আলো যেটি আমাকে টানে।

এভাবেই জীবন চলে, শান্তি আর ভালোবাসায়,
বিভিন্ন রঙে আঁকা জীবন, চিরন্তন সুরে ভরা যায়।
ভ্রমণের শেষ নেই, পথ শেষ হবে না কখনো,
এ এক অন্তহীন যাত্রা, বিস্তৃত হবে, আরও গভীর হবে।

কবিতা

শিশির ভেজা মেঠো পথে

জামাল হোসেন

শিশির ভেজা মেঠো পথ ধরে
এপাশে ভয়ার্ত ওপাশে ক্ষুধার্তের নয়নে পড়ে,
গিয়ে পৌঁছালাম রূপনগরে
যুগলে যুগলে জোয়ান গায় সুমিষ্ট সরে।

বাতাসের শনশনিতে রূপ নগরের চারিপাশ হেলে দুলে
আমি দেখেছি , আমি পেয়েছি
সিক্ত ভালোবাসায় আতিথেয়তা মাটির পাত্রের ঘ্রাণে,
হোক না সেটা কারো কাছে সেকেলে
গাছপালা আশ্রিত নদীর বাঁধে হেঁটেছি আমি পড়ন্ত বিকেলে।

তার পাশেই ধানের আঁটির বোঝা কাঁধে নিয়ে কৃষকেরা দলবেঁধে চলে,
উত্তপ্ত রোদে শিশু-কিশোররা গোল্লাই ছুটে হেঁসে বলে,
দৌড়ে গেলো দৌড়ে গেলো ধর ধর ওকে ,
পাইনি কেউ ছুঁতে রে,
পাইনি কেউ ছুঁতে,
ঐ ব্যক্তিটাকে ।

খেজুর রসের সুমিষ্ট ভারায়,
কনকনে শীতের রাতে নিজের ছোট্ট বাচ্চাকেও কাঁদায়,
অভাবের জীবন যে, তাদের নতুন করে কখনো একটুও না হাসায়।

রূপনগরের বাঁশের ঝাড়ে,
মন মোর বারংবার ঝুঁকেই পড়ে,
কতজনকেই না দেখে গেছিলাম,
এখন তারা শুয়ে আছে কবর গোরে,

সন্ধ্যা-ভোরে পাখি সবের কোলাহল,
নিকট গৃহে এসে পৌঁছায় ঘোড়গাড়ির দল,
ঐ শিশির ভেজা মেঠো পথে যেতে,
মোর মন থাকে সর্বদাই ছটফটে।

কবিতা

পথের পাথেয়

জুনায়েদ আহমেদ

ওরে যাত্রী, ওই শোনো দিগন্তের ডাক
পদ্মা-যমুনার বুকে জেগেছে তরঙ্গ-ফেনা,
মেঘের পালকে লিখে নাও পথের ঠিকানা,
চলো আজিকে ছিনিয়ে আনি সূর্যাস্তের আঁখি-পাতা!

ঝঞ্ঝার গর্জনে তালে বাঁধো পায়ের চুম্বন,
মাটির গন্ধে মাখো প্রাণ, ধূলির মহিমায়;
বটের শিকড়ে শুনো প্রাচীন সভ্যতার গান,
চলো না হার মানি গিরিশৃঙ্গের দর্প-হানা!

ঝিল্লির গুঞ্জরণে মিশে বাজুক বাঁশির সুর,
নিশীথের তারা যেন জ্বালো দীপাবলি-পথ;
মুক্তো-ছড়ান সাগরতীরে লিখি নাম সুরক্ষিত,
ভাঙ্গো গড়ো এই পৃথ্বীরে প্রেমের অগ্নি-অঙ্কন!

ক্লান্তি? ও নাম শোনেনি এ যুবকের প্রাণ,
পথেরই সন্তান আমি, পথই আমার গন্তব্য;
মৃত্যুকে করি হাস্যরঙ্গ, জীবন করি প্রমাণ
যত দূরে যাই, ততই কাছে পাই অজানার মন্ত্রণা!

"ভ্রমণ যে শুধু পথ নয়, সে তো প্রাণের বিদ্রোহ"
"নক্ষত্র লুটে আনা আলোয় জ্বালো অন্ধকার-ভাঙা"।

কাশ্মীর ভ্রমণ

গোবিন্দ মোদক

সোমবারের দিন জম্মু থেকে শ্রীনগরে এসে,
শিকারা চড়ে ডাললেকে সবাই পড়লাম ভেসে।
নেহেরু পার্ক ফটো তুললাম দেখলাম হাউসবোট,
হরি-পর্বতের গায়ে দেখা গেল প্রাচীন আকবর-ফোর্ট।

শঙ্করাচার্য মন্দির দেখলাম পরদিন-ই, মঙ্গলবার-এ,
চশমাশাহী, নিশাতবাগ - ডাল লেকের পূর্ব পারে।
তারপর গেলাম শালিমার বাগ, মহাদেব পর্বতের ঢাল,
গোধূলি-আলোয় দেখতে গেলাম পবিত্র হজরতবাল।

বুধবারদিন গান্ধারবল-এর অপরূপ পথ দিয়ে,
যাত্রা সফল হলো আমাদের শোনমার্গে-তে গিয়ে।
বৃহস্পতিতে ফুলের উপত্যকা গুলমার্গে গেলাম,
রোপওয়েতে চড়ে আমরা দারুণ আনন্দ পেলাম।

পহেলগাঁও-তে গেলাম আমরা পরদিন শুক্রবারে,
ওখান থেকেই চন্দনবাড়ী জিপে-ই এলাম ঘুরে।
শনিবার দিন উলার লেক আর মানসবল লেকে,
ক্ষীরের প্রসাদ পেলাম আমরা ক্ষীর-ভবানী থেকে।

রবিবার দিন কাটরায় এসে মাতা বৈষ্ণোদেবী দর্শন,
জম্মু-কাশ্মীর ভ্রমণ তখন হলো যে সমাপন।

“যাচ্ছি চলে”

মুক্তা আক্তার

যাচ্ছি চলে পাহারতলি, খুঁজতে একটা দেশ
যে দেশেতে জঙ্গলের নেই তো কোনো শেষ।

দূর আকাশে কালো মেঘ, ডাকছে আমায় হাত বাড়িয়ে
বৃষ্টিতে মাখা এই মনেতে, হাসতে শুধু প্রাণ খুলে।

খুঁজছি আমি খুঁজছি পথ, আঁকা-বাঁকা মেঠোপথে
বন পেরিয়ে উকি দিলো, পাহাড় চূড়ার ওই ঢাল যে।

ঝমঝমিয়ে পড়ছে পানি ঝর্ণা কন্যার গা বেয়ে
হাত বাড়িয়ে ছুঁই আমি, সেই পানি আবেশে।

কামার-কুমার, জেলে-চাষা ছুটছে সব নিজ কাজে
দেখছি আমি চোখ মেলে, সেই পথ যে দূর পাহাড়ে।

গিন্নীরা সব কোমর বেঁধে নেমেছে নিজের কাজে,
দেখছি আমি একপলকে তাদের করা মজার চলে।

চট্টগ্রামের সেই পথে যাচ্ছি শুধু ভ্রমণে
হারাচ্ছি নিজেকে পাহাড়ের ঘন বনে।

“নৈঃস্বর্গ সৌন্দর্য পিপাসু”

তপন মাইতি

পাহাড়-পর্বত আশেপাশের সবুজে সৌন্দর্য কী মনোরম!
দার্জিলিং বাগিচা নিয়ে বাউল ভাটিয়ালি বাঁধা হবে
সুন্দরবন সবুজ বুক দিয়ে নেমে আসছে যেন একটি রেখা
তাড়াহুড়ো অস্থির শাড়ির ভাঁজ ঠিক করতে করতে স্লিম নদীটা....

মায়াবী সোনালী কিরণ বলে তিন গতির প্রশংসার কথা
দুর্গম জেনে একজন একা অতি তরুণ প্রেমিক ওদিকে যায়
প্রতি বিকেলে রুটিন মাফিক ট্রেন...ঝালর পাল্টায় সাতরঙ তার রূপ
যেন পৃথিবীর সবচেয়ে রূপসী কণ্যার বাড়ি ওখানেই!

তার রক্তিম বিছানার পাশেই টুং টাং টুং পিয়ানোর মত ঝর্ণা
পরিশ্রমের ঘুম আসে বাংলা গানের ফুরফুরে হাওয়ার জ্যোৎস্নায়
সকাল দশটায় কতিপয় স্কুলগাড়ি হেলতে দুলতে নীচে নামে
কাঁটাতারের পাখি ভৈরবী গায় বাংলা ব্যান্ডের মত স্পষ্ট।

এলানো শরীরে ঘুমন্ত পাহাড়ের মনে প্রেমের ছবি
সয়ম্বরের খবর নিয়ে স্লিম নদীটা পৌঁছায় সুন্দরবনে
এক গেলাস পানি পিপাসু প্রেমিকার মনের মত আবেদন
তার চিঠিতে লেখা অমর একুশের ভাষা দিবসের সঙ্গীত।

ভ্রমণ

হাসান মুসান্না মিশু

দুনিয়াকে জানতে হলে
করতে হবে ভ্রমণ,
জ্ঞানের আলো জ্বালতে হলে
সুদূর চীনে গমন।

ঘুরতে পারো বন-বনানী
সাগর নদী পাহাড়,
দেখতে পারো মহান রবের
অতুল সৃষ্টি বাহার।

কোথাও যেন নেই কোন খাদ
নিখুঁত সৃজন তাঁর
দেশ-বিদেশে করলে ভ্রমণ
খুলবে জ্ঞানের দ্বার!

পানাম সিটি

মাহদী হাসান ফরাজী

ঘুরে এলাম পানাম সিটি,
সোনার গাঁয়ের জাদুঘর,
লোকশিল্প, রয়েল রিসোর্ট-
দর্শনার্থী বধু বর।

তাজমহল ও পিরামিডও
দেখতে ছিলো দারুণ বেশ,
উল্লেখযোগ্য স্পট এগুলোই
নারায়ণগঞ্জের পর্ব শেষ।

ফের ঢাকাতে- জিয়া উদ্যান,
সংসদ, গণভবন, আর?
দৃষ্টি নন্দন রমনা পার্ক,
শাহবাগের ওই জাদুঘর।

মিরপুরের চিড়িয়াখানা
নবীনগরের স্মৃতিসৌধ,
তৃপ্তি সবার নয়ন জুড়ে
মনে যেন মিষ্টি রৌদ।

বাঘের ডেরা

মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ হক

বাঘের ডেরায় গেলুম সেবার
বন্ধুরা সব মিলে;
বাঘ দূরে থাক, চিতাও যে নাই
কান ভাঙালো চিলে।

ডাঙার খাঁচায় পেলুম গিয়ে
শেয়াল, বেড়াল, হায়না,
হরিণ, বানর সব দেখা যায়
সিংহ দেখা যায় না।

ঝিলের পাড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে
দেখলুম চেয়ে নিচে,
কুমির কতক কাটছে সাঁতার
খুব নাড়িয়ে ফিচে।

বনের ধারে চোখ লাগিয়ে
খুঁজলুম গাছে গাছে,
সারস, টিয়া, ময়না ও বক
তিড়িং-বিড়িং নাচে।

সব হলো সই দেখার পালা
রইল বাকি সাপটি,
সে-ও পেলুম খাঁচার ভেতর
মেরে আছে ঘাপটি।

ফিরতি পথে কী এক দুঃখে
মনটি গেল ছেয়ে,
লাগছে কেমন ওদের সবার
বন্দী জীবন পেয়ে?

প্রশ্ন খুকির মনে

শাহজালাল সুজন

এই পৃথিবী হলে বড়
সূর্য কেন ছোট,
চাঁদ ও সূর্য দুজনাতে
আলো কেন দুটো?

নদী চলে এঁকেবেঁকে
পানি সরল পথে,
বাষ্প হয়ে বৃষ্টি পড়ে
উঠে আলোর রথে।

মাছের বাড়ি জলে হলে
ভিন্ন কেন তারা,
ইলিশ হয়না পুকুরেতে
নোনাজল ছাড়া।

বলো মাগো তারার মেলা
কেন চাঁদের সনে,
সূর্যের পাশে থাকেনা কেন্
প্রশ্ন খুকির মনে?

মাইনী নদি ভ্রমণ কালে

মুহাম্মদ আলম জাহাঙ্গীর

লংগদুর ঘাট বোটে চড়ে
রাঙামাটি যেতে,
শস্য দেখি নদীর দু-পাশ
উঁচু নিচু ক্ষেতে।

কাঁচাপাকা ধান কলাই পাট
দেখি সারি সারি,
ফসল ফলায় বাঙালি ভাই
চাকমা নর-নারী।

আঁকাবাকা নদি পথে
যেতে আরো দেখি,
ঝিরঝিরিয়ে জল পড়ে ভাই
পাহাড় হতে সে কি!

নদির জলে মাছ ধরে ভাই
বাঙালি চাক জেলে,
কলসি কাঁখে জল নিয়ে যায়
ঘোমটা বধূ ফেলে।

মাইনী নদির স্বচ্ছ জলে
পানকৌড়ি বক হাঁসে,
মাছ ধরে খায় সাঁতার কাটে
ইচ্ছে মতো ভাসে।

নদীর দু-পাশ পাহাড় গুলো
পিরামিডের মত,
শান্ত হয়ে বসে আছে
যেথায় শত শত।

পথে যেতে যায় দেখা যায়
ঝুপড়ি টংঘর মূর্তি,
এসব দেখে পর্যটকের
মনে আসে ফুর্তি।

ভ্রমণ করো নদি পথে
লংগদু ভাই যদি,
দেখতে পাবে বিচিত্র রূপ
সঙে মাইনী নদি।

স্বপ্নপুরী ভ্রমণ

এম আর মাহফুজ

আমরা যখন ভ্রমণ করি
কিংবা বনভোজন।
নানান রকম সাজ পোষাকে
ভিন্ন আয়োজন।

ভ্রমণে যাই সবাই মিলে
প্রাণের স্বপ্নপুরী।
নানান রকম দৃশ্য দেখে
মনটা যায় যে জুড়ি।

বাঘ,ভালুকের ভাস্কর্য আর
নানান কারুকাজ।
রঙ-বেরঙের ফুল বাগানে
নিত্য-নতুন সাজ।

ফুলে ফুলে ভ্রমর উড়ে
পাখির গাওয়া গান।
স্বপ্নপুরী ভ্রমণ করে
জুড়াই মন-প্রাণ।

শ্যামপুর,রংপুর

মুছাপুর ভ্রমণ

মুহাম্মদ তমিজুল হক রিপন

বাজার থেকে মুছাপুর
কয়েক কিলোমিটার,
আমরা তিনজন সাথে আছে
হারমনি আর গিটার।

যেদিকেতে ঘুরতে যাই
আমরা তিনজনের কমন,
তাইতো এবার পাড়ি দিলাম
করবো মুছাপুর ভ্রমণ।

হোকনা অটো মাইক্রোবাস
ভ্রমণে হয় মজা খুব,
স্রষ্টার সৃষ্টি অতুলনীয় রহস্য
অভিজ্ঞতাতে দেয় ডুব।

মুছাপুর যেন আমাদের কাছে
আল্লাহর সুন্দর সৃষ্টি,
যেদিকে তাকাই মন ভরে যায়
ফেরানো যায়না দৃষ্টি।

মুছাপুরের আকাশে বাতাসে
ফিরে পাই সবাই প্রান,
তাই তো আমরা তিনজনে
গাইলাম ভাটিয়ালি গান।

তাকিয়ে রইলাম সাগর পানে
উতলা মনে ঢেউ,
আল্লাহর সৃষ্টি এই জলরাশি
উপমা আছে কেউ।

সাগর পাড়ে মানুষের সারি
করছে মজা মাস্তি,
মানুষের এই মিলন মেলা
যেন সবাই সবার দস্তি।

আমরা তিনজন ঘুরে ঘুরে
দেখলাম লঞ্চ স্টিমার,
জোয়ার ভাটায় ঘুরছে সবি
সাগরের ঐ চারিধার।

অবশেষে দেখতে দেখতে
হারিয়ে গেল গতি,
আমরা তিনজন মুছাপুরের
টানলাম এবার ইতি।

ভ্রমণ

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

ভ্রমণ মনে সুখ এনে দেয়
ভ্রমণ মজা বেশ,
ভ্রমণ বাড়ায় জ্ঞানের সীমা
হৃদয় করে ফ্রেশ।

তাই যেন খুব ভ্রমণ করি
ভ্রমণ করি খুব,
দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে
দেখবো ধরার রূপ।

ঘুরতে যাব পাহাড়-চূড়ায়
ঘুরতে যাব বন,
সাগর জলে ঢেউয়ের খেলা
দেখতে টানে মন।

দেখতে যাব আঁধার গিরি
কঠিনতম পথ,
যাবই যাব রাখছি ভেবে
অদূর ভবিষ্যত।

দিক দিগন্তে

মাহফুজ রুমান খান

সাগর নদী দেখব আমি
বিশ্ব ঘুরে ঘুরে
যাব এবার পাহাড়-বন আর
পাখপাখালির মোড়ে

বনের মাঝে বন্ধু হব
হরিণ ছানার তরে
রবের নিখুঁত সৃষ্টি রেখে
ক্যামনে থাকি ঘরে।

সবাই যখন ফোনের স্কিনে
আমি না হয় ছুটব,
দিক দিগন্তে হেঁটে যাব
জ্ঞানের দিশায় ফুটব।

নওগাঁ সমাচার

শফিক শাহরিয়ার

আলতা দীঘি দিবর দীঘি আবার জবাই বিলে,
কাজের ফাঁকে নিলাম ছুটি ঘুরব সবাই মিলে।
সারি সারি আমের বাগান নেইকো আমের জুড়ি,
প্যারা সন্দেশ খেলে তোমার মনটা হবে চুরি।

রঙ লেগেছে মনের মাঝে ভাসাই খুশির ভেলা,
প্রাণের চেয়ে অতি প্রিয় আমার নওগাঁ জেলা।
একবার ছুটি বলিহারে একবার দুবলহাটী,
রাজবাড়ীটা গৌরব ছড়ায় আজও পরিপাটি।

হাঁসাইগাড়ী এসে দেখো ভ্রমণপ্রেমীর মেলা,
প্রাণের চেয়ে অতি প্রিয় আমার নওগাঁ জেলা।
পাহাড়পুরের কীর্তি দেখে স্বপ্ন চোখে আঁকি,
কুসুম্বা মসজিদে গিয়ে পরান মেলে রাখি।

আত্রাই নদী এসে দেখো ঢেউয়ের কোমল খেলা,
প্রাণের চেয়ে অতি প্রিয় আমার নওগাঁ জেলা।
ঘুঘুডাঙ্গার ঘুঘু দেখে মন হয়ে যায় পাখি,
তালগাছ যেন উঁকি মেরে করছে ডাকাডাকি।

ইচ্ছে করে হেথায় সেথায় ঘুরি সারা বেলা,
প্রাণের চেয়ে অতি প্রিয় আমার নওগাঁ জেলা।

পায়ের তলায় সর্ষে

মাহবুবা মঞ্জুর মীম

মানুষ আমি আমার কেবল পাখির মতন
মনটা,
ইচ্ছে করে বেড়াই উড়ে পাহাড়, সাগর,
বনটা!
ইচ্ছে করে হাওয়ায় ভেসে যাবো সাগর পাড়ে,
বালির ওপর ঢেউ এসে মন ভেজাক বারে
বারে।

আবার কখন ইচ্ছে করে বন পাহাড়ে যেতে,
বিশালতার নির্জনতায় উঠবো আমি মেতে।
কেমন করে পাহাড় চিরে ঝরণা দেখি নামে,
কত পথের পরে শেষে নদীর বুকে থামে।

কত জল যে, আছে জমে নদীর মোহনায়,
দেখব আমি কেমনে তারা সাগর পানে ধায়।
বনের মাঝে আছে যেথায় পাখপাখালি সব,
মনটা আমার সেথায় যেতে করছে কলরব।

কখনো বা ইচ্ছে করে পুরনো রাজবাড়ি,
ঘুরতে গিয়ে ইতিহাসের সাগরে দিই পাড়ি।
ইচ্ছে করে হ্রদের ধারে বসবো বিকেল বেলা,
নৌকো নিয়ে দেখবো জলে আলোছায়ার
খেলা।

দেখবো আমি জলপ্রপাত কেমন করে বর্ষে,
মানুষ আমি আমার শুধু পায়ের তলায় সর্ষে।

খুকির সফর

ইসমত আরা সুপ্তি

কু ঝিকঝিক চলছে গাড়ি
যাচ্ছে খুকি মামাবাড়ি
রেলগাড়িতে চড়ে।
ঝনঝনাঝন শব্দ তুলে
ছুটছে গাড়ি হেলেদুলে
রাত পেরিয়ে ভোরে।

বসে রেলের পূব জানালায়
গাছে কেমন দৌড়ে পালায়
দেখছে খুকি তাই,
পূব আকাশে সূর্য্য হাসে
তাদের সাথেও সূর্য্য আসে!
খুশির সীমা নাই।

রেল থেকে যেই নামলো ওরা
দেখলো কত গাড়ি-ঘোড়া
আসলো খেয়াঘাটে,
এবার দেবে নদী পাড়ি
তবেই পাবে মামার বাড়ি
থামলো গাঁয়ের হাটে।

নৌকা থেকে নামলো সবে
উঠলো মেতে নানান রবে
কিনলো কত খানা,
নানীর জন্য পান সুপারি
সাথে মিষ্টির কেজি চার-ই!
সন্দেশ দানা দানা!

আবার এসে নৌকায় বসে,
হাত ভরা তার মিষ্টির রসে
চললো খেয়া নাও,
খুব আনন্দ খুকির মনে
দেখা হবে সবার সনে!
ঐ যে মামার গাঁও!

হাসলো মায়ে নাচলো খুকি!
আজকে তারা ভীষণ সুখী
ঐ যে ঘাটে নানু!
নৌকা যেই না ভিরলো এসে
জড়িয়ে নানু ধরলো হেসে
কেমন আছো জানু!

ভালো আছি ভালো আছি!
এসে তোমার কাছাকাছি!
বললো ওরা হেসে।
যেই হয়েছে শীতের ছুটি
ছুটে এলাম আমরা দুটি।
খুকির নানুর দেশে!

ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যায় যারা সেরা লেখক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

লেখক পুরস্কার

শীত ও বিজয় সংখ্যা

মাসিক নবীনকণ্ঠ ডিসেম্বর-২০২৪ সংখ্যায়, যে-চারজন লেখক/লেখিকা **'সেরা লেখক'** নির্বাচিত হয়েছেন:

১. নুর আহমেদ সিদ্দিকী — প্রবন্ধ

২. সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম — ছড়া

৩. ওমর ইবনে আখতার — ইতিহাস

৪. ইসমত আরা সুপ্তি — গল্প

নির্বাচিত লেখকগণ নবীনকণ্ঠ'র ফেসবুক পেজের ইনবক্সে যোগাযোগ করুন

সহযোগিতায়: নাজিফ_NAZEEF
আভিজাত্যে অনন্য, বিশ্বাসে অটুট

নবীনকণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

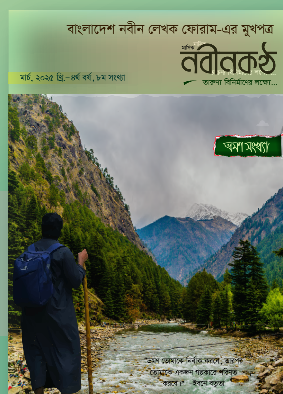

সৌজন্যে:

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. পাবলিকেশন্স

(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল: nobinkanthobnlf@gmail.com
যোগাযোগ: 01789204674